সাহিত্য সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ

২০০৮

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সাহিত্য সেমিনার

স্মারক-গ্রন্থ ২০০৮

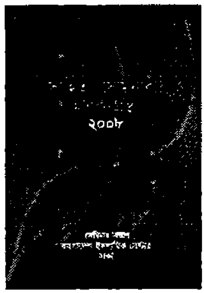

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

সাহিত্য সেমিনার

স্মারক-গ্রন্থ ২০০৮

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়

সেমিনার বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড [৪র্থ তলা]

ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৮৬২৭০৮৬-৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

প্রচ্ছদ

গোলাম মাওলা

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময়

চল্লিশ টাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

শব্দ-সংস্কৃতি
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ॥ ৫

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
হাসান আলীম ॥ ১৯

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস
শরীফ আবদুল গোফরান ॥ ৪৬

পরিশিষ্ট
সাহিত্য সেমিনার-প্রতিবেদন
মোশাররফ হোসেন খান ॥ ৫৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শব্দ সংস্কৃতি

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

■

শব্দের সমষ্টিই ভাষা। তাই বলতে গেলে, ভাষার সম্পদ হলো শব্দ। যে ভাষার শব্দ যত বেশি, সে ভাষা তত সম্পদশালী বা সমৃদ্ধ এবং মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশের জন্য তা তত বেশি উপযোগী। তবে কোন ভাষাই আদিতে ততটা শব্দ-সমৃদ্ধ থাকে না। গাছ যেমন বীজ থেকে অংকুরিত হয়ে ধীরে ধীরে লতা-পাতা, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কালক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়, ভাষাও তেমনি নানাভাবে শব্দ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এজন্য ভাষাকে অনেকে প্রবহমান নদীর সাথে তুলনা করে থাকেন। নদী তার উৎস-মুখে থাকে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সদৃশ, প্রান্তর-জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে যখন সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় তখন তা হয় বৃহদায়তন নদী। নদী যখন মাঝখানে তার গতি-পথ হারায় অথবা নানাভাবে পানি সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন তা হয় বিশুষ্ক মরা নদী।

ভাষাও তেমনি সতেজ-সজীব থাকে নানাভাবে সংগৃহীত শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে। অন্যথায় ভাষাও মৃত ভাষায় পরিণত হয়। পৃথিবীতে এরূপ শত শত ভাষার পরিচয় আমরা জানি যা এক সময় ছিল সজীব, প্রাণবান কিন্তু আজ তা মৃত, কেবল ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা এবং একটি সমৃদ্ধতম ভাষা। এ ভাষা একদিনে যেমন সৃষ্টি হয়নি, রূপ ও আকারেও তেমনি কখনো এক রকম থাকেনি। গাছ যেমন মাটির গভীর থেকে রস সংগ্রহ করে মোটা-তাজা, ফলে-ফুলে, লতা-পাতায় সুশোভন হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সব বড় ভাষাও তেমনি কালে কালে, নানা ভাষার শব্দ-সংমিশ্রণে ও নানা শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলাভাষাও তেমনি দীর্ঘ কাল ধরে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে, বিভিন্ন জনপদ, জনগোষ্ঠী, ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন প্রাকৃত, সংস্কৃত, পালি, আধুনিক প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিতে পূর্ণ বাংলা ভাষা। বিভিন্ন সময় বৈদেশিক শক্তি কখনো দেশ শাসন, কখনো লুঠ-তরাজ, কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য, কখনো পরিভ্রমণ আবার কখনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যখন এদেশে এসেছে তখন সে সব মানুষ ও তাদের ভাষার সংস্পর্শে এসে আমাদের ভাষাও নানাভাবে পরিগ্রহণ করে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের আদি অধিবাসীদের সঠিক পরিচয় না জানার ফলে যেমন তাদের বলি 'অনার্য' (অর্থাৎ যারা আর্য নয়), আর্য-পূর্ব এদেশের ধর্মকেও তেমনি এক কথায় বলা হয় অনার্য ধর্ম। এরপর জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ইত্যাদি বহু ধর্মের আগমন ঘটেছে বাংলাদেশে। সে সব ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শেও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে নানাভাবে। তাই বাংলাদেশ যেমন এক জাতির দেশ নয়, বাংলা ভাষারও তেমনি কোন আদি ও অপরিবর্তনীয় রূপ নেই। বিভিন্ন সময়ে দেশী-বিদেশী, তদ্ভব, তৎসম ইত্যাদি নানা জাতের অসংখ্য শব্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ও সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর এদেশে কেবল রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনই ঘটেনি, সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সর্বক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয় বাংলার ইতিহাসে তা অনন্য ও অভূতপূর্ব। এটাকে বলা যায় এক সর্বাত্মক বিপ্লব, যার শুভ পরিণতি ছিল অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। তবে ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে কেবল সেটাই এখানে আলোচনার বিষয়।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের রাজত্ব ছিল। তারা ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত আর্য-ব্রাহ্মণ্য জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। তারা দেশীয় ভাষা বাংলার চর্চাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সংস্কৃত পন্ডিতদের বিধান মতে ঃ

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরব নরকং ব্রজেৎ।"

ফলে সে সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন চর্চা করা সম্ভব ছিল না। তখন রাজ দরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেউ রাজ সভাসদ হতে পারতেন না। মুসলিম শাসনামলে এ নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটে এবং মুসলিম রাজা-

www.pathagar.com

শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নবজন্ম লাভ করে। বিজয়ী মুসলিমদের শাসন, জীবন-যাপন, শৌর্য-বীর্য-পরাকাষ্ঠা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানবিক মহত্তম ধর্ম ইত্যাদির পাশাপাশি তাদের উন্নত ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও অনিবার্যভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এরই ফলে আরবী-ফারসী-তুর্কী ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। এ সময় শুধু মাত্র আরবী-ফারসী ভাষা থেকেই আড়াই হাজারের অধিক শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয়। এত অধিক সংখ্যক শব্দের দ্বারা একটি জনমন্ডলী মোটামুটি তার ভাব প্রকাশে সক্ষম। অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র ভাষা গঠনের জন্য এ বিপুল সংখ্যক শব্দই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। সেন আমলের মৃতপ্রায় হত-দরিদ্র বাংলা ভাষা মুসলিম আমলে যখন নবজন্ম লাভ করে এবং বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয়েই স্বাধীন ও অনুকূল পরিবেশে ব্যাপকভাবে সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করে তখন এরূপ শব্দ-সঞ্জীবনী সুধাপানে নববলে উজ্জীবিত হওয়া বাঙালির জন্য এক রকম অপরিহার্য ছিল। নানারূপে, ভঙ্গীতে মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইংরেজ শাসনামলেও এমন কি, তার অনেক আগে থেকেই বিভিন্নভাবে ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষারও অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করে। এ প্রবণতা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশা করা যায়। এটা ভাষার সজীবতা ও সমৃদ্ধির লক্ষণ। এভাবে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবার কারণেই পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ঃ

"বাংলাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা পালি, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরাজী নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে গ্রন্থকারগণ (ব্যাকরণের) সে কথা একবারও ভাবেন না।"

প্রয়োজনে অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করা অন্যায় নয়। তবে জোর করে বা কৃত্রিমভাবে কোন কিছুই গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। অন্য ভাষার শব্দ যা জনগণ সহজভাবে গ্রহণ করেছে, ব্যবহারিক কাজে স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করেছে, কেবল সে সব শব্দই আমাদের নিজস্ব শব্দ-সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর দ্বারা ভাষা অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে জোর করে বা কৃত্রিম উপায়ে কখনো কোন শব্দ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়, সে ভাবে কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি গ্রহণের চেষ্টা কখনো ফলবতী হয় না। এর প্রকৃষ্ট নজীর আমরা দেখেছি, ইংরেজ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (স্থাপিত ১৮০০ সন) ইংরেজ পাদ্রী ও সংস্কৃত পন্ডিতদের দ্বারা তথাকথিত 'সাধু বাংলা' তৈরির প্রচেষ্টায়। তাঁরা বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত আরবী-ফারসী-উর্দু-তুর্কী শব্দরাজি বাদ দিয়ে অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দমালায় আকীর্ণ এক কৃত্রিম বাংলা ভাষা তৈরী করে তার নাম দিলেন 'সাধু বাংলা'। এ তথাকথিত 'সাধু বাংলা' সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন বলেন ঃ

"শতকরা নব্বইটি প্রকৃত বাংলা শব্দের স্থলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংস্কৃত শব্দ বসিয়ে বাংলা ভাষাকে তথাকথিত সাধু ভাষা বানানোর চেষ্টা করেছিলেন সংস্কৃত পন্ডিতগণ।"

তাই সে 'সাধু বাংলা', প্রকৃতপক্ষে যা ছিল 'সংস্কৃত বাংলা' বা কৃত্রিম বাংলা, জনগণের

www.pathagar.com

নিকট গ্রহণীয় হয়নি। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের পথে তা ছিল অন্তরায় স্বরূপ। তাই ইংরেজ পন্ডিত বহু ভাষাবিদ হ্যালহেড এ সম্পর্কে লেখেন ঃ

"বাংলা গদ্যের এই নব রূপায়ণ ঐতিহ্য-বিরোধী এবং ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে।"

ভাষার এ সংস্কৃতায়ন প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের মুখের ভাষায় সেই আদি ও অকৃত্রিম 'যাবনি মিশাল' বাংলাই চালু থাকে। এভাবে বাংলা ভাষা 'সাধু' ও 'চলতি' দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষার এ কৃত্রিম বিভাজন সম্পর্কে বেইন্‌স ১৮৯১ সনে আদম শুমারীর রিপোর্টে উল্লেখ করেন ঃ

"Bengali has no doubt been unfortunate in the circumstances that have attended its development. The vernacular has been split into sections: first the tongue of the people at large, which changes every few miles; secondly the literary dialect, known only through the press and not intelligible to those who do not also know Sanskrit. The latter form is the product of what may be called the revival of learning in East India, consequent on the settlement of the British on the Hoogly.... Instead of strengthening the existing web from the same material, every effort was made in Calcutta, the then only seat of instruction, to embroider on the feeble old frame a grotesque and elaborate pattern in Sanskrit, and pilfer from that tongue whatever in the way of vocabulary and construction the learned considered necessary to satisfy the increasing demands of modern intercourse."

সংস্কৃত পন্ডিতদের 'সাধু ভাষা' লেখ্য ভাষা হিসাবেও অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন সিংহ, টেকচাঁদ ঠাকুর প্রমুখ প্রকাশ্যেই তার বিরোধিতা করেছেন। এমন কি, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তীতে প্রমথ নাথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাপকভাবে তাদের লেখায় তথাকথিত 'সাধু বাংলা' কে অনেকটা সহজতর, বোধগম্য ও প্রসাদগুণসম্পন্ন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। 'সাধু বাংলা'র এ সহজিকরণ প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত কলকাতা-কেন্দ্রিক হিন্দু বাবু-সম্প্রদায়ের আধুনিক Standard Bengali Language এ পরিণত হয়। তবে সাধারণভাবে বাঙালি মুসলিম ও বিশেষভাবে পূর্ববাংলার মানুষের ভাষার সাথে তার দূরতিক্রম্য ব্যবধান থেকেই যায়। বাঙালি মুসলিমের কথ্য-ভাষায় তখনো 'যাবনি মিশাল' ভাষা তথা 'মুসলমানী বাংলা'রই প্রচলন থাকে। অবশ্য পাঠ্যবই-এর ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা হওয়ার কারণে সে কৃত্রিম 'সাধু ভাষা'র প্রভাব সর্বত্র, বিশেষত শিক্ষিত মহলে স্বাভাবিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সনে দেশ-বিভাগের পর ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতার একাধিপত্য তথা হিন্দু বাবু-সম্প্রদায়ের অভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটতে থাকে। ঢাকা-কেন্দ্রিক আমাদের নিজস্ব ভাষা আস্তে আস্তে আমাদের সাহিত্যের বা বইয়ের ভাষায় স্থান লাভ করতে থাকে। ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ভাষার এ গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া স্বভাবতই আরো জোরদার হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং সে আন্দোলনে আমাদের ত্যাগ ও প্রত্যয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ সনের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো কর্তৃক ২০০০ সন থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা দেয়ায় বাংলা ভাষার মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাও তেমনি বেড়েছে। বাংলা ভাষা এখন পনের কোটি বাংলাদেশীর নিরলস সংগ্রাম, সীমাহীন আত্মত্যাগ, জাতীয় গৌরব ও আত্মমর্যাদাবোধের মহত্তম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি ভাষার ভান্ডারে অসংখ্য শব্দ থাকে। সবগুলো শব্দের উপযোগিতা ও ব্যবহার এক রকম নয়। কোন কোন শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি আবার এমন অনেক শব্দ আছে যার ব্যবহার কালে-ভদ্রে হয়ে থাকে। অনেক শব্দ শিশু থেকে বৃদ্ধ, আম জনতা সব সময় নানা ভাবে ব্যবহার করে থাকে। আবার অনেক শব্দ এমন আছে যা কেবল বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য পরিভাষা রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য নয়। তাই শব্দের ব্যবহার বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত, উপযোগিতা ও প্রয়োজনের তাকিদেই হয়ে থাকে। পরস্পর কথপোকথনে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, লেখার সময় সে ভাষা ব্যবহার করি না। লেখ্য ভাষার একটি গ্রহণযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড রূপ আছে। এ স্ট্যান্ডার্ড রূপ আবার কলকাতা কেন্দ্রিক স্ট্যান্ডার্ড রূপ থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক স্ট্যান্ডার্ড বাংলার রূপ দিন দিনই ভিন্নতর হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা ভাষা বর্তমানে হিন্দী, ইংরেজী ও ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে ক্রমান্বয়ে যেমন ম্রিয়মান ও সংকুচিত হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে, ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়ে সগৌরবে বিশ্ব-পরিমন্ডলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে উন্মুখ। এদিক থেকে এর শক্তিমত্তাও সম্ভাবনা ও অপরিসীম।

কালক্রমে বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিভিন্নভাবে ভাষা নানা শব্দ গ্রহণে নিজস্ব ভান্ডার পূর্ণ করে। বাংলা ভাষার ভান্ডারও সেভাবে পূর্ণ হয়েছে। জন্ম-লগ্ন থেকেই এ পরিগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, তবে বাংলা ভাষার এ পরিগ্রহণের ইতিহাসে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামল এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঐ আমলেই সেন আমলের মৃতপ্রায় বাংলা ভাষার নবজন্ম ঘটে। অসংখ্য আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দ সমন্বয়ে বাংলা সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ও বিচিত্র ভাব প্রকাশের উপযুক্ত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যদিও ওগুলো বিদেশী শব্দ কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওগুলো সাধারণ মানুষের একান্ত পরিচিত, বোধগম্য ও অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য রূপে বিবেচিত হয়। তাই সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচশো বছর পর্যন্ত তা আমাদের কথ্য ও লেখ্য ভাষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয়। ইংরেজদের আগমন না ঘটলে আজো পর্যন্ত ঐ ধারা অব্যাহত থাকতো অর্থাৎ আরবী-ফারসী-উর্দু-তুর্কী মিশেল বাংলা ভাষাই হতো আমাদের মাতৃভাষা, ব্যবহারিক জীবনের ভাষা ও বইয়ের ভাষা।

যাই হোক, ঐ সময় বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী-তুর্কী ভাষার শব্দ এসেছে প্রধানত তিন ধরনের প্রয়োজন, উপযোগিতা ও প্রেক্ষাপটে। প্রথমত, রাজকার্য, প্রশাসন ও বিচার-আদালতের প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ ব্যবহারিক ও সাহিত্য-চর্চার প্রয়োজনে এবং তৃতীয়ত, ধর্মীয় পরিভাষা হিসাবে।

প্রথমোক্ত কারণে যে সব আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয় ও সাধারণভাবে জনসাধারণের ভাষার অপরিহার্য সম্পদে পরিণত হয় এরূপ কিছু শব্দের একটি তালিকা এখানে নমুনা হিসাবে প্রদত্ত হলো ঃ

আইন, আদালত, আদল, আমলা, ইজারা, ইনসাফ, ইস্তাফা, উজির, এজমালি, এজলাস, এজাহার, ওয়াক্‌ফ, ওকালত নামা, কবালা, কয়েদ, কানুন, কাজী, কুর্নিশ, খতিয়ান, খলিফা, খাজাঞ্চী, খাজানা, খারিজ, খালাস, চৌহদ্দি, জমাদার, জমি, জমা, জামানত, জমিদার, জঙ্গ, জরিপ, জাইগীর, জিজিয়া, তফসিল, তলব, তহসিল, তামাদ, তৌজি, দফতর, দফাদার, দখল, দফতরি, দফা, দফাওয়ারী, দফতরখানা, দরখাস্ত, দরবার, দস্তাবেজ, দাগ, দাদন, দাখিলা, দেওয়ান, নক্‌শা, নবাব, নফর, নাজির, নামজারি, নায়েব, নোকর, পরগনা, পরোয়ানা, পাইক, পালোয়ান, পিলখানা, পেয়াদা, পেশকার, ফরমান, ফরিয়াদি, ফৌজ, ফৌজদারী, বন্দুক, বদর, বন্দোবস্ত, বায়না, বরকন্দাজ, বরখাস্ত, বাদশাহ, বেআইনী, বেসরকারী, মামলা, মকদ্দমা, মক্কেল, মহকুমা, মহাল, মহাফেজ, মোক্তার, মোক্তারনামা, মুঘল, রায়ত, রায়তী, রেয়াৎ, লস্কর, লাখেরাজ, সরকার, সরকারী, সুবা, সেরেস্তা, মালিক, মালিকানা, সুলতান, সুলতানা, সেরেস্তা, সোলেহনামা, হলফ, হাজির, হাজিরা, হাকিম, হাবিলদার, হাসিল, হাজত, হাতিয়ার, হুলিয়া, দৌলতখানা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আরবী-ফারসী-তুর্কী ভাষার যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ ও কালক্রমে তা মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে সকল বাঙালির নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা দৈনন্দিন কাজে ও সাহিত্য-চর্চায় ব্যবহার করে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নমুনাস্বরূপ নীচে পেশ করা হলো ঃ

অন্দর, অছিলা, আকসার, আক্কেল, আঁখি, আখড়া, আচকান, আঞ্জাম, আঞ্জুমান, আদব, আদমি, আদাব, আদায়, আধা, আওরাত, আনার, আওলাদ, আন্দাজ, আওয়াজ, আপদ, আফসোস, আফিম, আরক, আবকার, আবরু, আবলুস, আবওয়াব, আবহাওয়া, আবা, আবাদ, আম (সাধারণ), আমিল, আমরুদ, আলখেল্লা, আলবৎ, আলবোলা, আলাদা, আশক, আশনাই, আসান (আহসান), আসমান, আস্তানা, আস্তিন, আয়না, আহম্মক, ইজার, ইজ্জৎ, ইয়ার, ইল্লৎ, ইশাদী, ইস্তক, উর্দি, একরার, এন্তেজার, এলম, এলাকা, ওয়াকিফ, ওরফে, ওস্তাদ, ওয়ালা, ওয়াস্তা, কমতি, কমজোর, কবুল, কমবক্ত, কসাই, কলম, কলমদানী, কসুর, কাজ, কাগজ, কদর, কেরামতি, কারখানা, কবুতর কিস্তিমাৎ, কলিজা, কিসমৎ, কাপড়, কাবিল, কাবু, কামাই, কামানি, কারদানি,

www.pathagar.com

(কেরদানী), কাহিল, কিমত, কিশমিশ, কিসম, কিস্তি, কুস্তি, কেচ্ছা, কৈফিয়ৎ, কোপ্তা, কোর্মা, কালিয়া, কোহিনুর, খতম, খতানো, খতিয়ান, খরিদ, খরিদ্দার, খবর, খবরদার, খয়রাত, খয়রাতি, খরগোশ, খরচ, খরমুজ, খসড়া, খসম, খাক, খাতা, খাতির, খানা, খাতুন, খানকী, খানদান, খানসামা, খামখা, খানুম, খাম, খামখেয়ালী, খালি, খালু, খালা, খাসমহল, খামার, খাসা, খাসি, খাদেম, খিদমত, খুন, খুশী, খুবসুরত, খুর্মা, খেজুর, খেসারত, খোজা, খোদ, খোশ, খোশবু, খোশামোদ, গজল, গয়রহ, গরজ, গরীব, গর্দা, গর্দান, গলদ, গলিজ, গাওয়া, গাফিল, গায়েব, গালিচা, গুজরান, গুম, গুমর, গুল, গুলজার, গোঁয়ার, গোয়েন্দা, গোলাব, গোলাম, গোস্তাকি, গদি, গন্ধ, গাড়ি, গামলা, ঘাবড়ানো, চক, চওড়া, চড়া, চমক, চরকা, চাওয়া, চাকতি, চাকর, চাকরানী, চালক, চাখা, চাঁদা, চাটাই, চাদর, চানা, চাপকান, চাপরাস, চাবুক, চালাক, চালান, চালু, চিকন, চিড়িয়া, চিলমচি, চেরাগ, চোষা, চোস্ত, চৌকস, চৌকা, চৌকাঠ, চৌকি, চৌকিদার, চৌচালা, চৌচির, চৌপদী, চৌপায়া, চৌবাচ্চা, চৌমাথা, চৌরাস্তা, চৌহদ্দি, ছবি, ছয়লাব, ছাউনি, ছাঁছি, ছাঁটি, ছাতি, ছাপ, ছাফাই, ছিলিম, ছেনি, জনাব, জবর, জবান, জবাব, জব্দ, জমা, জমাদার, জমানো, জরদ, জরদা, জরি, জরুর, জরুরী, জলদি, জলুশ, জল্লাদ, জহর, জহুরী, জা, জাঙ্গিয়া, জাজিম, জাত, জাদা, জান, জানোয়ার, জানবাজ, জাফরান, জামদানী, জামা, জায়গা, জায়দাদ, জাল, জ্বালা, জালিয়াত, জাস্তি, জাঁহাপনা, জাহাজ, জ্বি, জিগর, জিদ, জিনিস, জিন্দেগী, জিম্মা, জিন্দাবাদ, জিয়ানো, জিলা, জুলফী, জুলুম, জেব, জেয়াদা, জের, জেরবার, জোব্বা, জোয়ান, জোর, জোরওয়ার, ঝাড়, টিলা, টুটা, টুপি, ডর, ডুলী, ঢুলী, ঢুড়া, তক, তক্‌মা, তক্ত, তক্তা, তছনছ, তছরুপ, তদবীর, তদারক, তকদির, তনখা, তন্দুর, তফাৎ, তবক, তবলা, তবিয়ৎ, তহবিল, তমসুক, তৈয়ার, তর, তরকারি, তরজমা, তরজা, তহবন, তরতিব, তরফ, তরফদারী, তরফা, তরবারি, তরমুজ, তলব, তলবানা, তলাশ, তসবি, তহুরী, তাউই, তাউস, তাওয়া, তাক, তাকৎ, তাকাবী, তালিকা, তাগা, তাগার, তাগাদা, তাকিদ, তাজ, তাজিয়া, তাজ্জব, তাবিজ, তাঁবু, তাবে, তামাম, তামাসা, তামিল, তায়দাদ, তারিখ, তালিম, তালুক, তীর, তুফান, তেজ, তেজারৎ, তেজপাত, তেজালো, তেজী, তেসরা, তোড়া, তোতা, তোপ, তোবা, তোয়াক্কা, তোয়াজ, তোশক, তোশাখানা, তোষামদ, তাকিয়া, তারিফ, তকলিফ, তোড়া, থলিয়া, দমিত, দরকার, দরকারি, দরজি, দরদী, দরদ, দরদালান, দরাজ, দরজা, দস্তখত, দস্তানা, দস্তুর, দস্তুরী, দহরম, দাওয়া, দাখিল, দাগা, দাগাবাজী, দাঙ্গা, দাদ, দাতা, দাবা, দাবি, দামামা, দারোয়ান, দারু, দালান, দাস্ত, দিক, দিল, দিলখোশ, দিলদার, দীন, দুম্বা, দুশমন, দেউড়ী, দেওয়াল, দেখা, দেখানো, দেদার, দেহাতী, দেনা, দেমাগ, দেরাজ, দেরি, দোকান, দোতরফা, দোতলা, দোপিয়াজা, দো-ফলা, দো-ভাষী, দোশালা, দোসর, দোসরা, দোস্ত, দোহারা, দৌলত, দুনিয়া, ধোকা, ধোনা, ধুনিয়া, ধোপ, ধোপা, ধোলাই, ধোয়া, ধোপদস্ত, নও, নওবত, নকল, নকলনবীশ, নকীব, নগদ, নগদা, নঙ্গর, নজর, নজরানা, নেক নজর, নজির, নথি, নফর, নবিস, নমুনা, নর্দ্দমা, নরম, নসিব, নহবৎ, নহর, না, নাখোদা, নাখোশ, নাকড়া, নাকচ, নাকাল,

www.pathagar.com

নাগাল, নাছোড়বান্দা, নাজেহাল, না-পছন্দ, নাপাক, নাম, নামজাদা, নামঞ্জুর, নামা, নারঙ্গি, নারাজ, নাল, নালা, নালায়েক, নালিশ, নাস্তা, নাস্তানাবুদ, নাহক, নিকা, নিখরচা, নিমক, নিমকি, নিমখুন, নিমহাকিম, নিমরাজি, নিশানি, নিশানা, নিশানদিহি, দিশানদার, নেহাৎ, নোকর, নোকসান, পনির, পড়া, পয়সা, পয়মাল, পরওয়ারিস, পয়ার, পরা, পরানো, পরোয়া, পর্দা, পশম,পশমী, পাইকার, পাইকারী, পাগড়ি, পাঞ্জা, পাপোষ, পায়চারি, পায়দল, পায়া, পালঙ্ক, পালোয়ান, পিয়াজ, পেয়ার, পেয়ারা, পেয়ালা, পিয়াস, পিরান, পিয়ালি, পিল, পিলখানা, পুকুর, পুছা, পুদিনা, পেশ, পেশাদারী, পেশওয়ার, পেশওয়াজ, পেস্তা, পোক্ত, পোঁছা, পোলাও, পোশাকী, পোষা, পোস্ত, পুল, পাজামা, পাঁয়তারা, পান, পানদান, পিকদান, পালঙ, পোষ, ফাছাদ, ফকির, ফটক, ফতুর, ফতেহ, ফতুয়া, ফন্দি, ফন্দিবাজ, ফরক, ফরমাশ, ফারাগত, ফরাশ, ফরিয়াদ, ফরিয়াদি, ফর্দ, ফলনা, ফসল, ফাঁকি, ফাজিল, ফাঁড়া, ফায়দা, ফাঁসি, ফি, ফিকা, ফিকির, ফিরত, ফিরতি, ফিলহাল, ফুরসৎ, ফেরার, ফেরতা, ফেরি, ফেরেব, ফেরেববাজ, ফোয়ারা, ফৌত, বকরা, বকলম, বকশিশ, বকেয়া, বখরা, বগল, বজ্জাত, বজ্জাতি, বদ, বদখেয়াল, বদমতলব, বদজবান, বদরাগী, বদহজম, বদসুরত, বদবখত, বদন, বদনা, বদবু, বদমাশ, বদমেজাজী, বদল, বদলা, বদলি, বনাত, বনাম, বনিয়াদ, বুনিয়াদ, বন্দ, বন্দর, বন্দী, বন্দুক, বন্দোবস্ত, বমাল, বয়ান, বয়েৎ, বরগা, বরতরফ, বরদার, বরদাস্ত, বরবাদ, বরাত, বরাদ্দ, বরাবর, বগী, বস্তা, বেকুব, বহর, বহি, বহিন, বহু, বহুত, বহুতর, বহুদর্শী, বহুদূর, বহুভাষী, বহুমূল্য, বহুরূপী, বহুবার, বহুল, বাউল, বাগ, বাগিচা, বাচ্চা, বাজ, বাজার, বাজি, বাজিমাৎ, বেহায়া, বাজু, বাজে, বাজেয়াপ্ত, বাড়া, বাড়ানো, বাড়াবাড়ি, বাত, বাতলানো, বাতাস, বাতিল, বাদ, বাদাম, বাঁদী, বাপ, বাফতা, বাবদ, বাবরি, বাবু, বাবুর্চি, বারকোশ, বারবরতদার, বারুদ, বালাই, বালাখানা, বালপোষ, বাসিন্দা, বাহবা, বাহাদুর, বাহানা, বাহার, বাহাল, বিগড়ান, বিগড়ানো, বিদায়, বিনামা, বিবি, বিমা, বিলকুল, বিলাত, বিলি, বুজরুক, বুজ, বুজা, বুজানো, বুঝা, বুঝ, বুঝানো, বুঝি, বুড়া, বুড়ানো, বুঁদ, বুঁদি, বুঁদিয়া, বুনা, বুরুজ, বুলবুল, বুলা, বে, বেআন্দাজ, বেআক্কেল, বেআদব, বেআবরু, বেইজ্জত, বেঈমান, বেএক্তিয়ার, বেওজর, বেওয়া, বেওয়ারিশ, বেকসুর, বেকায়দা, বেকার, বেকুব, বেখরচা, বেখাপ, বেগতিক, বেগম, বেগায়েব, বেগার, বেগুন, বেগুনে, বেগুনী, বেচারা, বেগোছা, বেফিকির, বেচা, বেজাত, বেজায়েজ, বেজার, বেড়া, বেতার, বেতাল, বেদখল, বেদম, বেদস্তুর, বেদানা, বেদুইন, বেনামা, বেপরোয়া, বেপার, বেফায়দা, বেফাঁস, বেবন্দোবস্ত, বেবাক, বেবাকী, বেমওকা, বেমালুম, বেয়াড়া, বেয়াদব, বেরাদার, বেলা, বেলুন, বেলোয়ারী, বেশি, বেসরকারী, বেশরম, বেসামাল, বেহদ্দ, বেহাত, বেহায়া, বেহিসাবী, বেহুস, বোচকা, বোরকা, বোল, ভরসা, ভাগ, ভিজা, ভিস্তি, মক্কেল, মক্তব, মখমল, মগজ, মগজি, মজদুর, মজবুত, মজলিস, মজা, মজুদ, মজুমদার, মঞ্জিল, মতলব, মতিচুর, মফস্বল, মদদ, মবলগ, ময়দা, ময়দান, ময়লা, মরদ, মরিচ, মরিচা, মর্জি, মর্দ্দ, মর্ম্মর, মৌসুম, মলম, মলমল, মলিদা, মসগুল, মসলা, মহল, মাৎ, মাতব্বর, মাতোয়ারা, মাতোয়ালী, মানা, (নিষেধ), মানা, (মান্য

www.pathagar.com

করা), মানানো, মানে, মাফ, মামুলী, মায়, মারফৎ, মাল, মালখানা, মালগুজার, মালমশলা, মালাই, মালিকী, মালিশ, মালুম, মাশুল, মাস, মাসমাহিনা, মসকারী, মাসহরা, মাসিক, মাহিনা, মাহুত, মিছরি, মিটা, মিটানো, মিঠা, মিনা, মিয়াদ, মিল, মিলানো, মিহি, মুচলেকা, মুচি, মুচ্ছুদী, মুদা, মুদিত, মুদ্দত, মুদ্দাফরাস, মুনাফা, মুনিব, মুফৎ, মুরগী, মুরাদ, মুরব্বী, মুর্দ্দা, মুলতবী, মুস্কিল, মুসাবিদা, মুজুরী, মুরতী, মেরজাই, মেজাজ, মেরামত, মেহনৎ, মেহনতী, মিস্তি, মেহদি, মেহেরবান, মেহেরবানি, মোকাবিলা, মোকাম, মোক্তা, মোছ, মোজা, মোতাবেক, মোতায়েন, মোরগ, মোরব্বা, মোলায়েম, মোসায়েব, মোসাহেবী, যাওয়া, যাদু, যাদুকর, যাদুঘর, য়ুনানী, যোয়ান, রওয়ানা, রোয়াক, রকমারি, রগ, রগড়ানো, রং, রংদার, রংরেজ, রংমহল, রঙ্গিলা, রদ, রদবদল, রদ্দী, রপ্ত, রপ্তানী, রফা, রফাওয়ারী, রবিখন্দ, রশি, রসুন, রসদ, রসানো, রসিদ, রাং, রাখা, রাখাল, রাজি, রায়, রামায়ণ, রাশ, রাস্তা, রাহা, রাহী, রিফু, রিসালা, রুমাল, রেওয়াজ, রেকাব, রেজগি, রেজাই, রেশম, রেহাই, রোকা, রোজ, রোজানা, রোশনাই, রৌশন, রৌশনচৌকী, লটকানো, লপেট, লপেটা, লম্বা, লক্ষমান, লম্বিত, লম্বোদর, লব, লবেজান, লহমা, লাগ, লাগো, লাগাদ, লাগাম, লাচার, লাঠি, লাথ, লায়েক, লাশ, লেখা, লু, লুটতরাজ, লেফাফা, লোচ্চা, লোনা, লোবান, শক্ত, শক্তিমান, (শালী), শতরঞ্জ, শরম, শরাব, শরিক, শরিকানা, শহর, শহিদগা, শাহনামা, শাগরেদ, শাদি, শাল, শওকত, শামা, শামাদান, শামিয়ানা, শায়েস্তা, শিকার, শির, শিরদাঁড়া, শিরনামা, শিরোপা, শিশা, শিশি, শোহরৎ, শুমার, সওগাত, সওদা, সওদাগর, সওদাগরী, সওয়ার, সওয়াল, সখ, সড়ক, সদর, সদর দরজা, সন, সনদ, সনাক্ত, সপ্তাহ, সফর, সফেদ, সফেদা, সবুজ, সবুর, সবজি, সমঝ, সমঝদার, সমীহ, সরগরম, সরজমিন, সরঞ্জাম, সরফরাজ, সরফরাজী, সরবৎ, সরবরাহ, সরম, সরহদ্দ, সরাই, সরেশ, সরোজ, সর্দ্দার, সলা, সহবৎ, সহি, সাকিন, সাচ্চা, সাজশ, সাজা, সানাই, সাফ, সাবেক, সামনে, সামাল, সামিল, সারা, সারাদিন, সারেঙ্গ, সাল, সালতামামি, সালিস, সালিশি, সাহানা, সুদ, সুদখোর, সুপারিশ, সুমার, সুরৎ, সুরু, সুরুয়া, সুর্মা, সেতার, সেমাই, সেয়ানা, সেরা, সেরেস্তা, সেলাম, সোপর্দ্দ, সোরগোল, সোরাই, সোলেনামা, সৌখিন, হক, হকিকৎ, হজম, হদিস, হদ্দ, হয়রান, হর, হরকৎ, হরকরা, হরফ, হরেক, (হর-এক), হপ্তা, হলফ, হলফা, হস্তবুদ, হাওদা, হাওয়া, হাওলা, হাওলাৎ, হাঙ্গামা, হাজির, হাজার, হাজিরি, হাবশী, হামানদিস্তা, হামাম, হামেশা, হায়া, হাল, হালাক, হলকান, হালুয়া, হাশিয়া, হাসিল, হিকমৎ, হিজরা, হিন্দু, হিম্মত, হিল্লা, হিস্‌সা, হিসাব, হুকা, হুকুম, হুজুর, হুজ্জৎ, হুন্ডি, হেনা, হেফাজৎ, হেস্তনেস্ত, হাউজ, হরগিজ, হরিয়াল, হার্মাদ, হল্‌কা, হল্লা, হাউস, হাঁক, হাঁকানো, হাঁকাহাঁকি, হাতিয়ার, হামবড়া, হুবহু, হুরী, হুঁশ, হেরফের প্রভৃতি।

উপরোক্ত শব্দগুলো বাঙালি সর্বসাধারণ হরহামেশা এন্তার ব্যবহার করে বলে তা বাংলা ভাষার সাধারণ শব্দ-সম্পদে পরিণত হয়। বাংলা ভাষায় খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই তা আত্মীকৃত হয়। অন্যকথায়, এসব শব্দকে বিদেশী শব্দ বলে পরিহার করলে বাংলা ভাষাই হীন-দরিদ্র হয়ে পড়বে এবং বাঙালির ভাব প্রকাশও দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তাই

www.pathagar.com

এসব শব্দকে এখন আর বিদেশী শব্দ মনে করাই অযৌক্তিক। যা সহজ-স্বাভাবিকভাবে আমাদের ভাষায় আত্মীকৃত হয়েছে এবং জনগণ যা সহজভাবে গ্রহণ করেছে প্রকৃত পক্ষে তা-ই আমাদের ভাষার সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। এভাবে পরিগ্রহণ ও আত্মীকরণের মাধ্যমেই ভাষা সমৃদ্ধ ও প্রাণবান হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাও এভাবে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত এবং অনুরূপ শব্দ-সম্পদ গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত ধর্মীয় পরিভাষা হিসাবে যে সব শব্দ এসেছে তা বিশেষভাবে বাঙালি মুসলিমের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও একান্ত পরিচিত হলেও সাধারণভাবেও তার একটা পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজে এগুলো অপরিহার্য শব্দ হিসাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি যেহেতু মুসলিম সেহেতু এসব শব্দকে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ হিসাবেই গণ্য করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, বাংলা ভাষায় এসব শব্দের কোন বিকল্প বা উপযুক্ত প্রতিশব্দ নেই। সর্বোপরি, এসব শব্দ ইসলামী বা মুসলমানী বা মুসলিম সংস্কৃতির পরিচয়-জ্ঞাপক হওয়ার কারণে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ জাতীয় কিছু শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে নমুনা হিসাবে পেশ করা হলোঃ

আল্লাহ, আক্‌দ, আকীকা, আওলিয়া, আখিরাত, আযান, আম্বিয়া, ইবাদত, ইকামত, ইমাম, ইসলাম, ইদ্দত, ইনসাফ, ইহরাম, ইতিকাফ, ইলাহী, ইলহাম, ইফতার, ইস্তেখারা, ইস্তিহাদ, ইঞ্জিল, ওহী, ওজু, ওজীফা, ওলী, ওলিমা, ওস্তাদ, ওয়াজিব, কলেমা, কবর, কাফ্‌ফারা, কারামাত, কাফন, কিতাব, কিবলা, কিয়ামত, কিয়াম, কুরআন, কুদরাত, কুরবানী, খতিব, খতম, গেলমান, খোদা, গায়েব, গায়রুল্লাহ, গোসল, জমজম, জবুর, জান্নাত, জাহান্নাম, জায়নামায, জিহাদ, জানাজা, জিন, জুমা, তকদীর, তকবীর, তওবা, তারাবী, তালাক, তালকীন, তৌহিদ, তৌরাত, দেনমোহর, দরূদ, দোয়া, দাফন, দীন, দরগা, দরবেশ, দোযখ, নবী, নশর, নামায, নফল, নাত, নিয়ত, নেক, ফতোয়া, ফিতর, ফেরেশতা, ফযর, ফরয, বকরীদ, বন্দেগী, বান্দা, বেদআত, বেহেশত, বেঈমান, বিতর, মকতব, মকরূহ, মওত, মওলানা, মনযিল, মরহুম, মসজিদ, মাগফিরাত, মহররম, মৌলভী, মুকতাদি, মুসাফির, মুয়াজ্জিন, মুবাল্লিগ, মেরাজ, মেহরাব, মিনার, মুনশী, মিলাদ, মুসলিম, মুসলমান, মোসলমানী, মোল্লা, মোবা, মুর্শিদ, যাকাত, যবেহ, রব, রমযান, রসূল, রোযা, রোজ কিয়ামত, রূহ, রওজা, সওম, সদকা, সবর, সালাত, সুন্নাত, সেহরী, শহীদ, শয়তান, শাহাদাত, শির্‌ক, হজ্জ, হাজী, হারাম, হালাল, হিজাব, হাবিয়া, হাশর, হামদ, হাদিস, হিজরী, হিজরত, হুর ইত্যাদি।

এসব শব্দের সাথে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস, বিধি-বিধান, ইত্যাদি জড়িত। তাই বাঙালি মুসলিম অবশ্যম্ভাবীরূপে এসব শব্দের সাথে শুধু পরিচিত নয়, দৈনন্দিন জিন্দেগীতে হরহামেশাই তা বেশুমার ইস্তিমাল করে থাকে। এসব শব্দের মধ্যে এমন অনেক শব্দ রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। এসব শব্দ ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব শব্দ সেদিক থেকে

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতিরও অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ফলে এক সময় বাঙালি মুসলিম এসব শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এখানো সাধারণ বাঙালি মুসলিম সমাজে সহজ-স্বাভাবিকভাবে এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু অধুনা এক ধরনের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতিসেবী এসব শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে এসব শব্দের বাংলা পরিশব্দ ব্যবহারের অপচেষ্টা শুরু করেছেন। ফলে আমাদের বিশেষ আক্বীদা বা ধারণা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির যে তাৎপর্যময় দিক এসব শব্দে প্রকাশ হওয়ার কথা তা হতে পারছে না। দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন- 'আল্লাহ' শব্দটি আরবী এবং ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। এর প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরেজীতে 'গড' বাংলাতে 'ঈশ্বর', 'ভগবান', 'বিধাতা' ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দের যে অর্থ ও তাৎপর্য তা এর কোন একটি শব্দের দ্বারাও সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। 'আল্লাহ' শব্দের লিঙ্গ ভেদ বা বচনভেদ নেই। কিন্তু উল্লেখিত শব্দগুলোর তা আছে। অতএব, 'আল্লাহ' শব্দের কোন প্রতিশব্দ, অনুবাদ বা বিকল্প হতে পারে না। 'আল্লাহ' শব্দের সাথে 'তৌহিদ' শব্দের যে অর্থ ও তাৎপর্য্যগত সম্পর্ক- তাও অন্য কোন শব্দের দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এভাবে ইসলামের পরিভাষামূলক অনেকগুলো শব্দ রয়েছে যার সাথে ইসলামী ধারণা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যায়। যেমন, ইবাদত, ইন্তিকাল, ওজু, কুরবানী, জিহাদ, তওবা, তৌহিদ, দীন, মরহুম, মাগফিরাত, মে'রাজ, মেহরাব, মুসলিম, রব, সওম, সালাত, শহীদ ইত্যাদি। এ সবগুলো শব্দের এ ধরনের বাংলা প্রতিশব্দ বা অর্থ আজকাল করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ প্রতিটি শব্দের মধ্যে যে ধর্মীয় তাৎপর্য ও বিশেষ ইসলামী ধারণা বিদ্যমান তা এর প্রতিশব্দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন 'ইবাদত' শব্দের অর্থ করা হয় পূজা, উপাসনা ইত্যাদি। 'ইন্তিকাল' শব্দের অর্থ করা হয় মৃত্যু, দেহত্যাগ ইত্যাদি। 'ওহীর' অর্থ করা হয় প্রত্যাদেশ, 'ওযুর' অর্থ করা হয় হস্ত-পদ ধৌতকরণ, 'কুরবানী'র অর্থ করা হয় 'পশু হত্যা', 'জিহাদ' অর্থ ধর্ম-যুদ্ধ, 'তৌহিদ' অর্থ একেশ্বরবাদ, 'দীন' অর্থ ধর্ম, 'রোযা' বা 'সওম' এর অর্থ বা প্রতিশব্দ করা হয় উপবাস, 'শহীদ' অর্থ জীবনদান ইত্যাদি। এসব প্রতিশব্দ বা অর্থের দ্বারা ইসলামের যে বিশেষ তাৎপর্য ও ভাব-সঙ্গতি এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। এসব শব্দের দ্বারা শুধু ইসলামের ধারণা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে তাই নয়, ইসলামী সংস্কৃতিরও রূপায়ন ঘটে।

উপরোক্ত প্রতিটি পরিভাষাই ব্যাপক অর্থবোধক ও বিশেষ তাৎপর্যবহ। এর সাথে ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও জড়িত। যেমন 'ইবাদত' শব্দের দ্বারা পূজা-অর্চনা-উপাসনা নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহর হুকুম মানা। এ হুকুম মানা শুধু নামায, রোযা, হজ্জ-যাকাতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে পালন করার নামই ইবাদত। এভাবে ওহীর অর্থ শুধু প্রত্যাদেশ বললেই হবে না, স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর বিশেষ মনোনীত ব্যক্তির (রাসূল) মাধ্যমে মানবজাতির জন্য যে শাশ্বত নির্দেশনা বা হুকুম-

www.pathagar.com

আহকাম তাই ওহী। ওজুও তেমনি নিছক হাত-পা ধৌত করার নাম নয়, মহান প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প ও পবিত্র ইরাদা নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার নাম ওযু। ইন্তিকালের যথার্থ অর্থ হলো স্থানান্তর, ইহলোক থেকে পরলোক বা আখিরাতে গমন। এর সাথে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং জীবনের শেষ পরিণতির বিষয় সুস্পষ্ট হয়। মাগফিরাতের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় স্মৃতি তর্পন। অথচ মাগফিরাত শব্দে মৃত ব্যক্তির রূহের শান্তি কামনায় দোয়া খায়ের করা বুঝায়, বাংলা প্রতিশব্দে তা বুঝায় না। এভাবে প্রত্যেকটি পরিভাষারই এক নির্দিষ্ট অর্থ, তাৎপর্য ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে, যা বাংলা প্রতিশব্দে ঠিক মত প্রকাশ পায় না বা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নীচের বর্ণনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ঃ

একজন বাঙালি মুসলিম সুবহে সাদিকে মুয়াজ্জিনের আযানের মধুর আওয়াজে ঘুম থেকে জেগে ওযু করে মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে ফযরের ফরয নামায আদায় করে। নামায শেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে খানিকক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করে মসজিদ থেকে বের হয়। এরপর নাশতা খেয়ে বিসমিল্লাহ বলে দিনের কাজ শুরু করে।

উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দ (যা বাঙালি মুসলিম হর-হামেশা ব্যবহার করে থাকে) ব্যবহার করে একজন সাধারণ বাঙালি মুসলিমের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো দ্বারা তার যে বিশেষ সাংস্কৃতিক জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে, ঐসব আরবী-ফারসি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে তা কখনো ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

এমনিভাবে একজন বাঙালি মুসলিমের ঘরে সদ্যজাত শিশুর কানে আযান দেয়া থেকে শুরু করে তার আকীকা করা, খৎনা করা, বিসমিল্লাহখানি করা, কুরআনের ছবক দেয়া, নামায-দোয়া, ওযু-গোসল, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম শেখানো, আকদ্-রুসুমত, এমনকি, ইন্তিকাল-কাফন-দাফন, দোয়ায়ে মাগফিরাত, কুলখানি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বিশেষ পরিভাষা রয়েছে যা মূলত আরবী-ফারসী শব্দ হলেও বাঙালি প্রতিটি মুসলিম তার অর্থ বোঝে এবং ব্যবহার করে। আজকাল এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলিম আমাদের 'মরহুম' দের 'প্রয়াত' বলেন, মৃত ব্যক্তির লাশের 'গোসল-কাফন-দাফন-জানাজা' না করে 'মৃতের সৎকার' করেন, দোয়ায়ে মাগফিরাত' না করে বোবার মত নীরবে দাঁড়িয়ে 'স্মৃতি-তর্পণ' করেন।

অথচ এসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য্য, পবিত্রতা ও জীবন-দর্শন রয়েছে এবং সর্বোপরি এর মাধ্যমে বাঙালি মুসলিমের যে সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচয় আবহমান কাল থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা আজ সংকটের মুখে। আমরা কেউ বুঝে এবং অনেকেই না বুঝে এ আত্মঘাতি পথে পা বাড়িয়েছি। যারা বুঝে-শুনে এটা করছেন তারা নিশ্চয়ই সুপরিকল্পিতভাবে এটা করছেন। তাদের এটা জানা আছে যে, একটি জাতির আত্ম-পরিচয়ের জন্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য। এর অবর্তমানে জাতি আত্ম-পরিচয়হীন হয়ে পড়ে। আত্ম-পরিচয়হীন জাতি স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অযোগ্য বিবেচিত হয়। আর আমাদের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিশেষভাবে বলতে গেলে, বাঙালি মুসলিমের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই আমাদের জাতীয়তার মূলভিত্তি, এর ভিত্তিতেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাতচল্লিশে পকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও একাত্তুরে রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

অতএব, এ স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা মুছে ফেলার চেষ্টা আত্মহননেরই নামান্তর। বাঙালি মুসলিমের যেমন একটি ভৌগোলিক পরিচয় রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে বাঙালি মুসলিমের পরিচয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। তার অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্ম-পরিচয়ের জন্য এ দু'টো পরিচয়ই অপরিহার্য। এ পরিচয়ের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে এবং এ ভিত্তি মজবুত করার উপরই আমাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হতে পারে, আত্ম-সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ সমুন্নত হতে পারে এবং জাতির ভবিষ্যত সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে। তাই এ ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

যারা জেনে-বুঝে এ আত্ম হননের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তারা বাঙালি সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে থাকেন এবং বাংলা ভাষার প্রতি অতিভক্তির পরিচয় দিতে উদগ্রীব। তাদের অবগতির জন্য বলা দরকার যে, 'বাঙালি সংস্কৃতি' বলে নির্ভেজাল কোন সংস্কৃতি এদেশে কোন কালে ছিল না এবং এখনো নেই। এদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল এবং আছে। এগুলো হলো বৈদিক সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, অনার্য সংস্কৃতি, জৈন সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি ইত্যাদি এবং আর এক ধরনের সংস্কৃতি সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়েছে তা হলো সংকর সংস্কৃতি বা মিশ্র সংস্কৃতি এবং একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম হওয়ায় এবং তাদের সংস্কৃতি উপমহাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ায় তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পৌত্তলিক সংস্কৃতির অস্বচ্ছ সরোবরে অবগাহিত হয়ে আত্মবিলুপ্তি ঘটাতে চায়নি। তাই তারা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা অব্যাহত রাখার অপরিহার্য তাকিদেই ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তারই চূড়ান্ত পরিণতি বর্তমান বাংলাদেশ। অতএব, এখানে 'বাঙালি সংস্কৃতি'র দোহাই দেবার কোন অবকাশ নেই। ইংরেজ আমলে উপ-মহাদেশের মুসলিমদের আযাদী সংগ্রাম, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়-এ সবের পেছনে মুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় স্বতন্ত্র চেতনা এককভাবে ক্রিয়াশীল। আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা ও সংহত করার অপরিহার্য তাকিদে আমাদের এ স্বাতন্ত্র্য চেতনাকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের জাতীয়তার মূলভিত্তি দুর্বল হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষার প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনকারীদের জানা থাকার কথা যে, ব্রাহ্মণ সেন আমলের 'রৌরব' নামক নরকের ভয়ে যারা বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা থেকে দূরে ছিল, মুসলিম শাসনামলে তারাই মুসলিম রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে মৃতপ্রায় বাংলা ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। সাতচল্লিশে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি মুসলিমরাই আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে

www.pathagar.com

এবং প্রাণ দিয়েছে। উনিশ শো নিরানব্বই সনেও কতিপয় বাঙালি মুসলিম যুবকের দাবির কারণেই বাংলা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো ২০০০ সন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অতএব, যাদের হাতে নবজন্ম, যাদের হাতে বিকাশ, যাদের রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ এবং যাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, তাদের হাতেই বাংলা ভাষার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও সুবিকাশ নিশ্চিত হতে পারে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তাই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে মাতৃভাষার সুবিকাশ ও যথাযথ মর্যাদা বিধানে আমাদের সচেতন ও দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। ■

লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান– বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক এবং সভাপতি- ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২০ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

হাসান আলীম

■

ভূমিকা

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মানবজাতির ভাষা সৃষ্টি একটি বৈপ্লবিক বিষয়। পৃথিবীর প্রথম ভাষার সাথে বাংলা ভাষার একটি সম্পর্ক রয়েছে।

এ জন্য মানুষের প্রথম ভাষার চারিত্র্য নির্ণয় করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথম মানুষ প্রথম ভাষা- এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম মানুষের শনাক্ত করণের মাধ্যমে তার ভাষারও পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে প্রথম মানুষের ভাষার সাথে বাংলা ভাষারও একটি সম্পর্ক সূত্র বের করা যাবে। এর সাথে বাংলা ভাষাভাষী মানব গোষ্ঠির উৎপত্তিও চলে আসবে।

মানুষের প্রথম ভাষা এবং বাংলা ভাষার একটি কথ্যরূপ এবং ধ্বনিগুচ্ছ রয়েছে। আবার এর লেখ্যরূপ বা লিপিমালা বা বর্ণসমগ্রও রয়েছে।

প্রথম মানুষের সাথে প্রথম বাঙ্গালী ও তার ভাষার উৎপত্তি কেন্দ্র এবং ভাষার উচ্চারণ রীতি এবং লেখ্য রীতির সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য এ তল্লাটে বাঙ্গলী জাতির এবং তাদের ভাষা ও বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

প্রথম মানুষ : প্রথম ভাষা

প্রত্যেক সৃষ্টি জীবেরই ভাষা রয়েছে। পশু-পাখী, জীবজন্তু, গাছ-পালা, তৃণ-লতা, এমনকি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থেরও ভাষা রয়েছে। সব মানুষ সব মানুষের ভাষা জানেন না। তবে কেউ কেউ অনেক ভাষা জানেন। এমনকি কোন কোন মহা মানব জীবজন্তু পশু-পাখীর ভাষাও জানতেন, বুঝতেন। এক্ষেত্রে নবী সোলায়মান (আ) এর কথা উল্লেখ করা যায়।

মানুষ নিজে চেষ্টা করে প্রথমেই ভাষা শিখতে পারেনি। এদেরকে মহান রবই ভাষা শিখিয়েছেন অথবা ভাষা শেখার উপকরণ এবং পিরবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

"আর-রাহমান। আল্লামাল কুরআন। খালাকাল ইনসান। আল্লামাহুল বায়ান।" (আর রাহমান) অর্থাৎ তিনি দয়াবান স্রষ্টা। যিনি কুরআন পড়তে শিখিয়েছেন বা পড়া শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন বা ভাষা শিখিয়েছেন। এখানে স্পষ্ট হয় যে, স্রষ্টা মানুষকে পড়াশেখার যোগ্যতা এবং পড়ার জন্য কথা বলার যোগ্যতা বা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে ভাষা প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোন ভাষার কথা বলা হয়নি। মানুষও কোন নির্দিষ্ট গোত্রের মানুষ তাও সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে মহান স্রষ্টার এ কথাটি সব মানুষের এবং সব ভাষার প্রসংগেই বলা হয়েছে। আমরা তাই বলতে পারি পৃথিবীর সব মানুষের সব রকম ভাষাই স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। ভাষা প্রসঙ্গে আল কুরআনে আরও আয়াত রয়েছে যেমন- 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল লাজি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাজি আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম।- (আল আলাক : ১-৪) অর্থাৎ আল্লাহর নামে পড় যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে ভ্রূণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনুগ্রহশীল তোমার মহান রবকে অধ্যায়ন কর, জানো। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।

এ বক্তব্যে স্রষ্টা কর্তৃক পড়া ও লেখার যোগ্যতা দানের কথা বলা হয়েছে এবং মানুষকে অজ্ঞাত বিষয় বা অদৃশ্য বিষয় আবিষ্কার করার ক্ষমতা দানের কথা বলা হয়েছে।

সৃষ্টির প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)। তিনি বেহেস্তে ছিলেন সেখান থেকে স্রষ্টা তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। বেহেস্তে তার ভাষা ছিল আরবী। আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে রয়েছে : "এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সব জিনিসের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (আল বাকারা, ৩১-৩৩)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে সুস্পষ্ট যে স্রষ্টা আদমকেই (আ) সব বস্তুর নাম অর্থাৎ ভাষা বা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। যেহেতু স্রষ্টার ভাষা আরবী তাই তিনি আদমকে আরবীতে ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরবী যে বেহেস্তের ভাষা তা মহানবীর (সা) বাণী থেকে জানা যায় : "আরবী ভাষা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কারণ এ ভাষা কুরআনের ভাষা, এটা জান্নাতের ভাষা এবং এটা আমার মাতৃভাষা"।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আগমন করে আদম [আ] এর কাছে বংশধরেরা আরবী ভাষাতেই কথা বার্তা বলতেন। তাঁদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা। এজন্যই আরবী প্রথম মানুষের ভাষা, আরবী পৃথিবীর প্রথম ভাষা। পরবর্তিতে এ ভাষা থেকেই অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি হয়- যা স্রষ্টারই সৃষ্টি। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গোত্রের ভাষা বৈচিত্র্যও স্রষ্টার সৃষ্টি। সূরা আর রুম- এর ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে : "এবং তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"

ভাষা এবং ভাষার প্রকারভেদ

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য অন্যের কাছ যে অর্থময় ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করে যার একটি লিখিত রূপ রয়েছে তাকে সাধারণভাবে ভাষা বলা যায়।

ভাষা প্রকাশের নিয়ামক বা প্রয়োজনীয় উপাদান হল ১. মেধা ও মনন ২. ভাষা প্রকাশের ইচ্ছা বা কামনা ৩. ভাষা প্রকাশ বা উচ্চারণের জন্য সুনির্দিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছ ৪. ধ্বনি প্রকাশের জন্য কন্ঠস্বর ও স্বরযন্ত্র ৫. মুখগহ্বরের বাতাস ও তরল পদার্থ বা পানি।

একজন সক্ষম চিন্তাশীল মানুষ তার ইচ্ছা প্রকাশ বা কামনার জন্য যে অর্থময় ধ্বনিপুঞ্জ স্বরযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করে তা-ই ভাষা হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই ভাষা প্রকাশের উপরোক্ত নিয়ামক উপস্থিত থাকা স্বত্ত্বেও যদি মুখগহ্বরে প্রয়োজনীয় বাতাস বা অক্সিজেন এবং পানি না থাকে তবে তা প্রকাশ করা কঠিন হবে। শ্বাস নিঃশ্বাসহীন শুষ্ক কণ্ঠে কখনো কথা বলা যায় না। তাই বর্ণিত ৫টি নিয়ামক স্রষ্টার অপার দান। এসবের কোন একটির অভাব হলে তা মনুষ্য ভাষা হিসাবে গণ্য হবেনা।

ভাষা প্রাকাশের দুটি রূপ প্রধান যথা :- মৌখিক ও রৈখিক বা লেখ্যভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নানা ভাষা রয়েছে। ভাষা গবেষকদের মতে পৃথিবীতে ২৭৯৬ টি ভাষাগুচ্ছ রয়েছে। এসব ভাষাগুচ্ছের আবার উপভাষা বর্গ রয়েছে। আদি ভাষামূল সেমেটিক ও হেমেটিক শাখায় যে কটি ভাষা পরিবার রয়েছে এদের সংখ্যা ২৫/২৬ এর মত। যেমন : ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মানি ইন্দো-ইরানী আর্যভাষা ও ইন্দো-ভারতীয় আর্যভাষা ইত্যাদি। এসব ভাষা পরিবারের আবার উপভাষা বর্গ রয়েছে।

আদিভাষা- ১. সেমেটিক শাখা পরিবারবর্গ ২৫/২৬
২. হেমেটিক শাখা পরিবারবর্গ

ভাষা পরিবার থেকে ভাষাবর্গ সৃষ্টি হয়। যেমন উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ভাষা পরিবারের রয়েছে ৩৫১টি পৃথক ভাষাবর্গ। ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইংরেজী ভাষার সমধর্মি ১৩২টি ভাষা বর্গ রয়েছে। সুদান নিউগিনিভাষা পরিবারের অধীন রয়েছে ৪৩৫টি স্বতন্ত্র ভাষা।

www.pathagar.com

আদম (আ) প্রথম মানুষ। তাঁর ভাষা আরবী। আদম (আ) এর বংশধরদের মধ্যে কততম বংশ নূহ (আ) তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। হযরত নূহের দু'পুত্র সাম এবং হাম। সামের বংশধর ও তাঁদের ভাষা সামেটিক এবং হামের বংশধর ও তাদের ভাষা হামেটিক হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে পরিচিত। পন্ডিতগন ভাষাকে সেমেটিক এবং হেমেটিক এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এবং এদের থেকেই কতোম ও শতম গুচ্ছ হিসাবে ভাষা বিভক্ত হয়েছে।

সেমিটিক বিভাগ ঃ কুরআন ও বাইবেলের মতে হযরত নূহ বা নোহার জৈষ্ঠ্যপুত্র সামা এই সাম বা সেম (Sem বা Shem) এবং তার বংশধরেরা পৃথিবীর যে অঞ্চলে বসবাস করত তা সামদেশ এবং তাদের ভাষাকে সেমেটিক ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিব্রু, ফনেসীয়, ক্যালডীয়, এসেরীয়, আরবীয়, ব্যাবিলোনীয় এবং তাদের উপভাষা সমূহ সেমেটিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার ওপর সেমেটিক ভাষার প্রভাব রয়েছে।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষা সেমেটিক তথা আরবী ভাষা থেকে সরাসরি উদগত।

আরবী→ সেমেটিক→ হিব্রু, এসেরীয়, আরবীয়, ব্যাবিলনীয়, ইন্দো ইরানীয় প্রভৃতি।

হেমেটিক বিভাগ ঃ হযরত নূহ (আ) এর কনিষ্ঠ পুত্র হাম এর নাম অনুসারে তাঁর জাতি ও ভাষার নাম হেমেটিক জাতি ও হেমেটিক ভাষা।

আফ্রিকার কপ্‌টিক (Coptic), ইথিওপিয় (Ethiopio) আবেসিনীয় (Aby Shiniay) প্রভৃতি ভাষা সমূহ এবং তাদের উপভাষা বর্গ হেমেটিক ভাষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

আরবীয় ⟶ হেমেটি⟶ কপটিক,ইথিওপিয়, আবেসিনীয়, প্রভৃতি।

ভাষা বিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে সেমেটিক ভাষা বিভাগের অন্তর্গত ইন্দো-ইউরোপিয় বর্গ, ইন্দো-জার্মেনী বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্গকে আবার উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে দু'টি গুচ্ছ ভাগ করা হয় যথা : কতোম বা কেন্মভাষাগুচ্ছ এবং শতুম বা সত্তুম ভাষাগুচ্ছ।

কে তুম ভাষা গুচ্ছে কণ্ঠধ্বনি বা 'ক' এর প্রাধান্য রয়েছে এবং শতুম-এ 'শ' বাচক বা 'শ' 'স' ধ্বনি প্রাধান্য রয়েছে।

ড. সুকুমার সেন পৃথিবীর সব ভাষাকে ১২টি বর্গে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. ইন্দো-ইউরোপীয় ২. সেমিয়-হামিয় ৩. বান্টু ৪. ফিন্নু উগ্রীয় ৫. তুর্ক-মাঙ্গোল, মাঞ্চু, ৬. ককেশীয় ৭. দ্রাবিড় ৮. অষ্ট্রিক ৯. ভোটচীন ১০. উত্তর পূর্ব সীমান্ত ১১. এস্‌কিমে ১২. আমেরিকার আদিম ভাষাগোষ্ঠি।

www.pathagar.com

আরবী ভাষার জ্যেষ্ঠতা

বর্তমানে আরবী পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষা। কিছু পণ্ডিতজনের অভিমত, আরবী ভাষা সেমেটিক ভাষা শাখার একটি পরিবার মাত্র। কিন্তু সেমেটিক ভাষা সাম-এর ভাষা। সাম (আ) নূহের (আ) পুত্র। নূহ (আ) একজন নবী। তিনি প্রায় ৯০০ বছর আল্লাহর দীন প্রচার করেন। তাঁর নিকট নিশ্চয় আল্লাহর বর্ণবদ্ধ গ্রন্থ ছিল। আর এ গ্রন্থের ভাষা ছিল আরবী। কারণ আল্লাহর পছন্দনীয় ভাষা আরবী। তবে হযরত নূহের ব্যবহারিক আরবী ভাষা আধুনিক আরবী ভাষা থেকে অনেক পৃথক। কারণ তিনি আদম (আ) এর বহুপরের এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর বহু পূর্বের একজন প্রধান নবী। তাঁর জবানী আরবী ভাষা আদমের (আ) বেহেস্তি বিশুদ্ধ আরবী থেকে আলাদা এবং নবী মুহাম্মাদ (সা) এর শুদ্ধ আরবী থেকে পৃথক। আলোচনার সুবিধার্থে নূহের (আ) আরবী ভাষাকে নূহাস আরবী ভাষা বলা যেতে পারে।

হযরত আদম (আ) ⟶ হযরত নূহ (আ) ⟶ হযরত মুহাম্মাদ (সা)
আরবী ভাষা ⟶ আরবী ভাষা ⟶ আরবী ভাষা

নূহের (আ) পুত্র সামের ভাষাতে আরবী ছিল কিন্তু সেই আরবী ভাষা তার নামেই সেমেটিক ভাষা বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ সামের ভাষা বর্তমানের আধুনিক আরবীর মত শুদ্ধ ছিল না। এজন্য সামেটিক ভাষার মূল আরবী ভাষা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিনের মতে সেমেটিকের মূল আরবী ভাষা, কারণ–

১. সেমেটিক ভাষার প্রায় সব বর্ণ তুলনামূলক ভাবে অন্যভাষা অপেক্ষা আরবীতেই বেশী রয়েছে।

২. ব্যাকরণের খুটিনাটি সূক্ষ্ম বিষয় আরবীতেই বেশী অন্যান্য ভাষার তুলনায়।

৩. আরবীতে হিব্রু ও আরমীর সকল শব্দের ধাতুর সন্ধান মেলে কিন্তু হিব্রু ও আরামীতে আরবীর সব ধাতু পাওয়া যায়না। হিব্রু ও আরামীর বহু শব্দের ধাতু নিজস্ব ভাষায় নেই অথচ আরবীতে রয়েছে।

৪. কোন শব্দের অংশ বিশেষ হিব্রু ও আরামীতে রয়েছে কিন্তু আরবীতে রয়েছে পূর্ণ ভাবেই।

৫. আরবীর ক্রিয়াপদ গঠিত হয় নিয়ম মাফিক কিন্তু হিব্রু ও আরামীর অনেক ক্রিয়াপদ অনিয়মিত ভাবে গঠিত হয়।

৬. হিব্রু ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক সিফর-ই-আয়্যুব-এ প্রচুর আরবী শব্দ রয়েছে। এতে হিব্রু অপেক্ষা আরবীর প্রাচীনতাই প্রমাণিত হয়।

৭. সামীদের অর্থাৎ সেমেটিকদের আদি বাসস্থান আরবদেশ। এই দেশের অধিবাসী বিশেষ করে হেজাজ ও নজদের লোকরা বাইরের সংস্পর্শে খুব কমই এসেছে। তাই তাদের ভাষা ছিল অবিকৃত এবং মূল সামীর নিকটতম ভাষা।

www.pathagar.com

এজন্য আরবীকে উন্মুল- আলসিনা বা ভাষার জননী (Mother of Languages) বলা হয়।

আরবী বর্ণমালাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম বর্ণমালা। আরবী বর্ণমালা থেকে বিভিন্ন বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ ভাষা বিজ্ঞানী Hoffman তার Beginning of writing নামক গ্রন্থে বলেছেন- The semitic people comprised three principle divisions each of which developed letters. To the Phoenicians may be traced the origin of the Greek alphabet which become the parent of the various alphabets of Europe from; the high lands of Asia-minor, Aram, proceeded the tranian group of alphabets which replaced the cuneiform witting as a script of the eastern province of the persian Empire, to the south semitic type the ancient Alphabet of India with the numberless scendants must be referred (P. 166)

সেমেটিক জাতি তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকেই বর্ণমালার সাধনা করে :

১. ফিনিসিয়ানরা গ্রীকদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দেয়, গ্রীকদের কাছে থেকে সমগ্র ইউরোপ তা শেখে।

২. এশিয়া মাইনরের ভিতর দিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যে তা বিস্তার লাভ করে।

৩. দক্ষিণ ভাগ দিয়ে প্রাচীন ভারতকে তা গ্রহণ করে এবং কালে কালে এ ভারতীয় বর্ণমালা থেকে অন্যান্য অসংখ্য বর্ণমালার সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য আরব, মিসর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, ব্যবিলন, আসিরিয়া, হিব্রু প্রভৃতি সেমেটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিকদের মতে মিসর দেশেই সর্বপ্রথম বর্ণমালার আবির্ভাব হয়। সেগুলি অবশ্য আসল অক্ষর নয় বরং চিত্রাক্ষর। মিসরিয়দের কাছ থেকে এ বর্ণমালা ফিনিসিয়রা শিক্ষা করে এবং পরে ফিনিসিয়ানদের কাছ থেকে গ্রীকরা তা গ্রহন করে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আরব দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন তাতে প্রমাণ হয় আরবেই প্রথম অক্ষরের উৎপত্তি ঘটে। এসব শিলালিপির মধ্যে মোয়াব প্রদেশের মেসাহ নামক এক রাজার শিলালিপিই উল্লেখযোগ্য।

সেমেটিক বর্ণমালা থেকেই ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি এ কথা আমরা আরও জানতে পাই Taylor এর নিকট থেকে। তিনি বলেন- 'To some very ancient but unknown period, we must also assign the origin of the primitive Arabian or Ishmaelite alphabet, which become the parent of the Ethiopic and Indian alphabets.' অর্থাৎ আরবী বা ইসলামী বর্ণমালার উৎস মূল অতি প্রাচীন। আরবী বর্ণমালা থেকে হাবশী এবং ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার উৎপত্তি : বাংলা জনপদ : বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি

বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর ভাষা। বাংলা ভাষার সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য বাঙ্গালী জাতির উত্থান সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে অতি নিগুঢ ভাবে। কে এই বাঙ্গালী জাতির বা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির প্রথম জনক, প্রথম নেতা, তা জানা খুবই দরকার।

বংলা শব্দটি বং শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। বং একটি জাতির নাম। একজন মহামানবের নামও বটে।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলীম তার 'রিয়াজুস সালাতীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন- 'হযরত নূহ (আ)-এর দৌহিত্র হিন্দ-এর নামানুসারে হিন্দ নামকরণ হয়। হিন্দের পুত্র বং [বঙ]-এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন।'[১] বস্তুত, হিন্দের পুত্র বং গংগা নদীর পাড়ে যে সভ্যতা- যে জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটান সেই জাতিই বাঙ্গালী বা বং জাতি।

নূহ (আ)-এর মহা প্লাবনের পর তাঁর সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। হযরত নূহের (আ) তিন পুত্র জেফেত, সাম ও হাম ইতিহাস খ্যাত। সামের বংশধরেরা পৃথিবীতে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেন। এই সভ্যতা সামেটিক বা সেমেটিক নামে পরিচিত।

অধ্যাপক আখতার ফারুক 'বাঙ্গালীর ইতিকথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- 'আবিরের দৌহিত্র কাহতাম সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তিন চার হাজার বছর আগে সিন্ধু ও পরবর্তী কালে গংগা নদীর উপকূলে চলে আসেন। সিন্ধু নদীর তীরে তারা মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার পত্তন করেন। আর গংগা নদীর তীরে এসে তারা গড়ে তোলেন দ্রাবিড় সভ্যতা। সামের প্রপৌত্র ও আবিরের দৌহিত্র, হযরত নূহ (আ)-এর সপ্তম স্তরের পুরুষ আবুফীর হলেন ভারতীয় দ্রাবিড়দের আদিপুরুষ। আবুফীর ভারতে এসে তার দাদা আবিরের কিংবা তাঁর নিজের নামেই এদেশের নাম দিলেন 'দারে আবির' বা আবিরের ঘর। ভারতবর্ষ নাম হওয়ার আগে এ উপমহাদেশের নাম ছিল দার-আবির।
এই দার আবির থেকেই কালক্রমে দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ হয়।[২]

নূহ (আ)-এর উত্তর প্রজন্ম স্মরণি

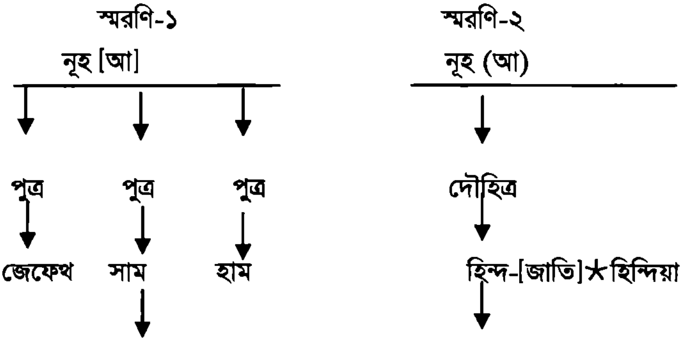

www.pathagar.com

পুত্র   পুত্র

↓   ↓

আরফাখশাদ   বঙ★[জাতি] ★বাঙ্গালী

↓

পুত্র

↓

কায়নাম

↓

পুত্র

↓

শালিখ

↓

পুত্র

↓

আবির

নূহ নবীর পুত্র ইরাকে বসাবাস করতেন। এই এলাকায় তিনি একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দেন। এই সভ্যতার পৃথিবী খ্যাত সেমেটিক সভ্যতা বা সামেটিক সভ্যতা। ইরাকে এই সভ্যতার উন্মেষ হয় বলে ইরাকের পূর্ব নাম সাম।

খৃষ্টজন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্বে ইরাক বা সাম এলাকা থেকে নূহ [আ]-এর উত্তর পুরুষ বর্তমান ভারতে চলে আসেন এবং দ্রাবিড় সভ্যতার সৃষ্টি করেন।

দ্রাবিড়দের পরিচয় পাওয়া যায় 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা' থেকে: "At a still prehistoric stage, it is belived that an infolw of what are closely called Dravidian race made its way through Baluchistan from western Asia and slowly penetrated India to south."

এখানে দেখা যায় এই দ্রাবিড় জাতি-গোষ্ঠির আগমন ঘটেছিল বেলুচিস্তানের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম এশিয়া থেকে। এরা কালক্রমে ভারতে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণে চলে যায়।

বর্তমান ভারতবর্ষে দ্রাবিড়দের পূর্ব পুরুষ নূহ (আ)-এর বংশধরেরা খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে আগমন করেছিল। এদের এক হাজার বছর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে আর্যদের আগমন ঘটেছিল এই ভারতে ভূখণ্ডে।

স্বভাতই প্রশ্ন ওঠে দ্রাবিড়দের পূর্বে ভারতে কোন জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল? এ প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

ভারতের বিশিষ্ট লেখক হুসাইন আহমদ-এর একটি তাত্ত্বিক পুস্তিকা অবলম্বনে বলা যায়, পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম [আ] স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন ভূমণ্ডলের ভারত ভূমিতেই। জায়গাটা ছিল সিংহল সেটা তখন ভারতেই অন্তর্ভুক্ত ছিল।'[৩]

অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়- ভারতের জনগোষ্ঠী ছিল পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম নবী প্রথম মুসলিম হযরত আদমের সন্তান সন্ততি। "ভারতের অযোধ্যায় এক বিরাট মন্দিরের পাশে সুদীর্ঘ এক কবর রয়েছে সেটা সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে জনশ্রুতি-ঐ সমাধি হযরত শীষ আলাইহিস সালামের। তিনি ছিলেন আদি পিতা হযরত আদমের পুত্র।[৪]

ভারত ভূমি সম্পর্কে আলী [রা]-এর একটি বাণী এ বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলে। তিনি বলেন- 'ভারত ভূমি- যেখানে হযরত আদম স্বর্গ হতে নেমে এসেছিলেন এবং মক্কার ভূমি যা হযরত ইব্রাহিমের (আ) দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত এই দুই স্থান উত্তম ভুখন্ড।[৫]

হযরত ইব্রাহিমের (আ)-এর আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষ ছিল আদম (আ)- এর উত্তর পুরুষের মূল ভূখণ্ড।

নূহ (আ)-এর মহা প্লাবনের পর ভারত আবার জন অধ্যুষিত হয় হযরত নূহ (আঃ) এর উত্তর পুরুষ দ্বারাই। মূলত ভারত ভূমি আধুনিক সভ্যতায় সজ্জিত হয়েছিল এদেরই হাতে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার নির্মাতা ছিল নূহ নবীর উত্তর পুরুষ দ্রাবিড়দের হাতে। আর এ সভ্যতার ধ্বংস হয়েছিল বহিরাগত আর্য অমুসলিমদের হাতে। আর্যরা যে বহিরাগত এ কথার প্রমাণ মেলে বিনয়ঘোষ লিখিত 'ভারতজনের ইতিহাস' গ্রন্থে। তিনি বলেন- "আর্যদের সম্বন্ধে ব্যাবিলনীয় ও এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ভাষায় লেখা যেসব বিবরণ পাওয়া গিয়েছে তাহাই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ। এই উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে উত্তর হইতে ককেশাস পর্বত পার হইয়া, অথবা উত্তর গ্রীস ম্যাসিডনও থ্রেস প্রদেশ হইয়া কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া মাইনরের পথ ধরিয়া মেসাপোতামিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে।"[৬]

আর্যদের সম্পর্কে ড. নিমাই সাধন বসু 'ভারত ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে বলেন- "কেউ বলেন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল আবার কেউ বলেন উত্তর মেরু প্রদেশ, কেউ বলেন আর্যদের আদিভূমি মধ্য এশিয়া, আবার কারো মতে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ায়। কোন মতটি যে বেশী গ্রহণযোগ্য তা বলা দুরূহ। তবে আর্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত মত হল বহুদিন আগে কোন অঞ্চলে গ্রীক, রোমান, ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ জাতির পূর্ব পুরুষেরা ও আর্যরা এক সঙ্গে বাস করতেন। পরে এক সময়ে এরা বিভক্ত হয়ে নানান দিকে যাত্রা করেন। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাদের বংশধরদের বসতি গড়ে ওঠে। এভাবে তারা পারস্য ও ভারত বর্ষে প্রবেশ করে বসতি করেন।[৭]

আর্যদের ভারত বর্ষের আগমন কাল সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিক Chokolingam pillai বলেন ঃ "It is needliss to mention that the question [Arya-

www.pathagar.com

Dravidion Problem] was first set in motion no the day the Aryan entered India which event we shall soon see took place in the 15th century B.C India prior to this entry, was a Dravidian land."[৮]

আর্যরা দ্রাবিড় ভূমি ভারতে প্রবেশ করেছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। এখন স্বভাকতই প্রশ্ন জাগে দ্রাবিড়রা এই ভারতে কখন প্রবেশ করেছিল? ইতিহাস পর্যালোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় দ্রাবিড়রা আর্যদের এক/দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রবেশ করেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ, আর, হল- বর্ণনা করেন, "ভারত বর্ষই দ্রাবিড়দের প্রাচীন বাসস্থান তারাই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বালুচিস্তানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারাই হযরত ঈসা [আ]-এর জন্মের তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলন অধিকার করে ব্যাবিলনীয় ও আসিরিয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই দুই সভ্যতার প্রাচীন অধিবাসীগন সেমিটিক জাতীয়।"[৯]

খৃষ্টপূর্বে ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে এবং দ্রাবিড়দের সাথে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রাবিড়দের নির্মিত হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদারো নগর সভ্যতার পতন ঘটে। পরাজিত দ্রাবিড় জাতি তখন তাদের আত্মিয় মালাবারের দ্রাবিড়দের নিকট ব্যাপকভাবে চলে যায়। অপর অংশ তাদের মাতুল জাতি গোষ্ঠী নূহ (আ)-এর দৌহিত্র হিন্দের উত্তর পুরুষ বং জাতি বা বাঙ্গালী জাতির আবাসস্থল গংগা তীরবর্তী অঞ্চলে বাংলায় চলে আসে। ড. মোহর আলী 'হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন, 'আর্য আগ্রাসনের শিকার হয়ে নির্যাতিত দ্রাবিড়রা' ভারতীয় উপমাহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বঞ্চলে সরে এসেছে এবং তাদের অনেক সেসব অঞ্চল থেকে বাংলায় এসেছে।" ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় তার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন-"আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহারই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে।"

এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বংগ মগধের আদিম অধিবাসী। তিনি আরও বলেন, 'যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বংগ অথবা পুন্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে অথবা মগধে আর্য জাতির বাস ছিল না।[১০]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট করে বলতে পারি :

১. 'হিন্দ' নূহ নবীর দৌহিত্র। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠি ও সভ্যতা হিন্দিয়া নামে পরিচিত। এই হিন্দিয়া কারক্রমে ইন্ডিয়া বা হিন্দুস্তান হিসেবে পরিচিত হয়। মূর্তি পূজারক আর্য এবং তাদের উত্তর অনুসারীদের ধর্ম ভেদে হিন্দু নামে অভিহিত করা ঠিক নয়।

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম পূর্বে ছিল বেদাশ্রিত-বৈদিক ধর্ম। বৈদিক ধর্ম নিরাকার স্রষ্টার উপাসনার কথা প্রচার করে। হিন্দু প্রকৃত অর্থে পৌত্তলিক ধর্মাশ্রিত কোন একক জাতি নয় বরং হিন্দ জাতি নূহ নবীর উত্তর পুরুষ এরা সিন্ধু নদ তীরবর্তী জ্ঞাতি গোষ্ঠী হিসেবে হিন্দিয়া বা হিন্দ বা হিন্দু জাতি।

www.pathagar.com

২. ভারতবর্ষের পূর্ব নাম দারআবীর বা দ্রাবিড়দের আবাস ভূমি। এই দ্রাবিড়রা সেমেটিকদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নূহ নবীর পুত্র সামের উত্তর পুরুষ।
৩. বং জাতি নূহ নবীর উত্তর পুরুষ। তার দৌহিত্র হিন্দের পুত্র বা সন্তান। বং একজন মহামানব। বং এর বংশধরেরা বাঙ্গালী জাতি। তাই বাঙ্গালী মানেই নূহ নবীর উত্তর পুরুষ, বাঙ্গালী মানেই মুসলমান।
এই বাঙ্গালীকে আর্যরা ঘৃণা করে ম্লেচ্ছ বা যবন বলে তাদের ধর্মগ্রন্থে অভিহিত করে থাকে।
৪. বাঙ্গালী মানেই নূহ নবী অর্থাৎ তার পুত্র সামের বংশধর-সামেটিক সভ্যতার উত্তর ধারক। এই বাঙ্গালীদের বাংলা স্বাভাবিকভাবেই সেমেটিক বর্ণলিপি বা সেমিটিক ভাষার সাথে অনেকাংশে সমরূপী হবে। আদি বাংলা রূপ, কথ্যরীতি এই সভ্যতার অনেক প্রমাণ দেয়।

লিপিতত্ত্ব

সুনির্দিষ্ট অর্থময় ধ্বনিগুচ্ছ মুখে প্রকাশের মাধ্যমেই ভাষার সৃষ্টি হয় কিন্তু এর লেখ্যরূপ কখন এবং কিভাবে শুরু হয় তা জানতে সবার ইচ্ছা করে। এ জন্য সঠিক অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রয়োজন। ভাষা যেমন মহান রবের সৃষ্টি, লিপিও স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনিই লেখনী বা কলমের মাধমে মানুষকে লেখা শিখিয়েছেন- 'আল্লাজি আল্লামা বিল কালাম'। শুধু কুরআনের ঘোষণাই নয় বরং দার্শনিক ও ধর্ম যাজকদেরও ধারণা, লিপিও স্রষ্টাদত্ত। এমন বিশ্বাসই মুসার অনুসারীদের। মিশরীয় ধর্মনেতাদের ভাষা হায়রোগ্লাইকিক লিপি স্রষ্টার তৈরি এমন বিশ্বাস মিশরীয়দের। গ্রীকদের বিশ্বাস গ্রীকবর্ণমালা ক্যডমাস দেবতা বেহেস্ত থেকে সংগে করে এনেছেন। চীনাদের বিশ্বাস তাদের চারচক্ষুওয়ালা ড্রাগন দেবতা স্যাং- চিয়েন (T'san chien) তাদের চীনা লিপি শিক্ষা দিয়েছেন।
ব্যাবিলনীয়দের ধারনা মারডুক পুত্র দেবতা 'নেবো' (Nebo) এবং রোমানদেবতা মার্কারি তাদেরকে বর্ণমালা উপহার দিয়েছে।
ভারতের বেদে উল্লেখ রয়েছে প্রথমে স্রষ্টা বা ব্রক্ষ্মা শব্দ বা নাদরূপে বিরাজমান ছিলেন। পরবর্তীতে 'বৈখরী' নামে ভাষা বাক্য সৃষ্টি করে নিজেকে ব্যক্ত করেন। তিনিই 'অ' কারদি স্বরবর্ণ এবং 'ক' কারাদি হলবর্ণের মাধ্যমে ভাষা সৃষ্টি করেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে মানুষ ভাষা ও বর্ণমালা সৃষ্টি করেছে এবং এ জন্য সে সৃষ্টির সেরাজীব।
ঐতিহাসিক এডাম,লুক,স্মিথ, ডুগালাঙ্গ, স্টুয়ার্ট প্রমুখেরা মনে করেন ভাষা ও বর্ণমালা স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট নয়। এ সবের স্রষ্টা মানুষ নিজেই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে লিপিবিজ্ঞান বা Palaeography বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় এবং বর্তমান কালেও তা প্রসারিত। লিপিবিজ্ঞানের অন্য শাখা হল খোদাইকৃত লিপি পাঠতত্ত্ব বা ইপিগ্রাফি (Epigraphy)
ইপিগ্রাফির মধ্যে গ্রিক ইপিগ্রাফি, ল্যাটিন ইপিগ্রাফি, ও হিব্রু ইপিগ্রাফি বিষয়ে ব্যাপক

www.pathagar.com

গবেষণা হয়। খোদাইকর্ম সাধারণত শিলা ফলক ধাতুফলক ও মৃত্তিকা ফলক প্রভৃতিতে হয়ে থাকে। খোদাই বা ইপিগ্রাফি থেকে প্রাচীন পৃথিবী বা প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লিপি বিজ্ঞানের সংগে আরেকটি তত্ত হল ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তাক্ষর প্রণালী। প্রথম মানব গোষ্ঠির বর্ণমালার সৃষ্টি, অগ্রগতি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে লিপি বিজ্ঞানে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আজও চলছে।

বর্ণমালা উদ্ভব সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা করা যায়। যেমন*: মনের ভাব প্রকাশ ও ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব রাখার জন্য বিভিন্ন পুষ্প, পল্লবের ব্যবহার। কখনও কখনও চিত্রাঙ্কন কখনও বা পশু পাখীর পদচিহ্ন অংকনের মাধ্যমে বর্ণের বা লিপির প্রকাশ ঘটে। চিত্রাঙ্কন থেকে যদি লিপির উদ্ভব ঘটে থাকে তবে সৃষ্টির প্রথম থেকেই ভাষা ও বর্ণের উদ্ভব হয়েছে কারণ মানুষ মুখে কথা বলার আগে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করত বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীতে এই চিত্রই ক্রমে ক্রমে বর্ণে বিবর্তিত হয়েছে।

লিপি কিভাবে তৈরি হয়েছে বা অক্ষর নির্মাণের মোটিফ কি- এ বিষয়ে তিনটি আদর্শ বা মডেলের চিন্তা করা যায়ঃ

প্রথমত: অংকুরোদগম পর্ব। এ পর্বে মানুষ তার চারপাশের আকর্ষণীয় বস্তু গভীরভাবে অবলোকন করে। এসব বস্তুর চিত্রকল্প থেকেই চিত্রলিপি এবং ক্রমে বর্ণ লিপির বিকাশ ঘটে।

দ্বিতীয়ত: পশু-পাখি, জীবজন্তু, কচ্ছপ, সরীসৃপদের পদচিহ্ন থেকে বাছাই করা বিশেষ কিছু চিহ্নের প্রতিকৃতি। এবং এই প্রতিকৃতির চিহ্নলিপি থেকেই বর্ণলিপির উদ্ভব ঘটে।

কুইপো গ্রন্থির অনুকৃতি থেকে কেউ কেউ সরাসরি অক্ষরলিপি তৈরি করেছিল।

সেমেটিকজাতির তীরন্দাজ শাখার লোকেরা তীরের সাহায্যে করা সংকেত তৈরি করেছিল। এবং এক পর্যায়ে বাণমুখ (cuniefrom) লিপির মটিফ নির্মাণ করেছিল।

তৃতীয়ত: এ পর্যায়ে লোকেরা নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা ও উত্তরাধিকারীর দানের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধারায় অক্ষর-সংকেত বা লিপি সংকেত নির্মাণ করে।

ভারতে ও বাংলাদেশে স্বরচিহ্ন প্রয়োগ রীতিটি খুব প্রাচীন। ভারতীয়শাস্ত্র 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণের বিবরণের স্বরবর্ণ ও হল বর্ণের প্রয়োগ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। প্রফেসর গর্ডন শিল্ডের মতে " সুনির্বাচিত স্বরবর্ণের স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও স্বর চিহ্নের সুনির্ধারিত ও বিশুদ্ধ ক্রিয়া লক্ষণ দৃষ্টে অনুমিত হয় ভারতীয়দের কাছ থেকেই ফনেসিয়, আরব, আর্মেনীয় ও আইওয়ানগণ সর্বপ্রথম স্বরচিহ্নের প্রয়োগে ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি পরিবর্তনের কৌশল শিখে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার করেছে।

বিভিন্ন পুরাকীর্তিতে প্রাপ্ত চিত্রলিপি, ভাবলিপি শব্দলিপি ও বর্ণলিপিসহ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অপ্রচলিত লিপির সম্ভাব্য তালিকা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

আল কুরআনে ভাষা, লিপি বা বর্ণমালার লেখ্যরূপ সম্পর্কে আয়াত রয়েছে। যেমন : 'কসম তুর পাহাড়ের, ও সেই গ্রন্থের, যা লিখিত আছে– প্রসারিত পাতায় এবং বায়তুল মামুরে' (সূরা আত্ তুর ঃ ১-৪)

www.pathagar.com

বাংলা লিপির উদ্ভব ও প্রাচীনতা

বাংলা ভাষার উৎপত্তির সাথে তার লিপির জন্মকালও প্রায় একরূপ হবে। বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির সাথে সাথেই এর ভাষা ও লিপির জন্মসন সম্বন্ধযুক্ত।

দ্রাবিড় জাতি ও বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব প্রায় কাছাকাছি। খৃস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে দ্রাবিড় জাতির ভারতে অবস্থানের কথা জানা যায়। সে হিসেবে বাঙ্গালীরাও তৎকাল সময়ের অধিবাসী। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির লিপি মালার প্রাচীনতা নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের লেখক গবেষকদের যে মতামত তা হল– বাঙলা লিপিমালার উদ্ভব কাল একাদশ-দ্বাদশ শতকে। ইউরোপিয় লিপি তাত্ত্বিক বুহ্যলরের অভিমত-খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ব ভারতীয় নাগরী লিপি হতে ক্রমশ বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নাগরী লিপি থেকে বাংলা লিপির সৃষ্টি হয়নি। এ মতের পক্ষে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'In the twelfth entury we come across a number of historicla events... In this century we find that completion of the development of the modern Bengali script with exception of a few letters'.

ড. দীনেশচন্দ্র সেন রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ মতের সাথে সম্পূর্ণ একমত নন। অর্থাৎ বাংলালিপি নাগরী লিপি থেকে উৎপন্ন নয় বরং বহুপূর্ব কালের।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা লিপির সঠিক জন্মসন না বললেও যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে বাংলা লিপির গভীর প্রাচীনত্ব ফুটে ওঠে। 'ললিত বিস্তর' নামের গৌতমবুদ্ধের জীবনী গ্রন্থের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন– 'যদি ললিত বিস্তর-এর প্রমাণ গণ্য করা যায়, তবে ২২০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল।

হিউয়েন সাঙ এর মতে বুদ্ধদেবের জন্ম ৮৫০ পূর্ব খৃস্টাব্দে। 'ললিতবিস্তর' নামের গৌতমবুদ্ধের জীবনী গ্রন্থ রচিত হয় আরও এক হাজার বছর পর। এ হিসাবে ললিতবিস্তর খৃস্টিয় দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মাপোদেশ 'শীল'-এ বুদ্ধের শিশুকালের বর্ণ শিক্ষা অক্ষরিকার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ যে অক্ষরিকা শিখেছিলেন তা তার জন্মের বহু পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল।

এ থেকে বুঝা যায় অক্ষরিকাগুলো অনেক প্রাচীন। এই অক্ষরিকা থেকে বুদ্ধ ৪৫টি বর্ণ লিখেছিলেন। পরবর্তীতে বাঙলা ৫০ বর্ণের ভিত্তি ঐ অক্ষরিকা। ললিত বিস্তরে যে ৬৪টি লিপি বর্গের পরিচয় পাওয়া যায় তার পঞ্চমটি বঙ্গলিপি।

গৌতমবুদ্ধ খৃস্টপূর্ব ৮৫০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি 'শীল' ধর্মাপোদেশে যে অক্ষরিকা শেখেন তাতে বঙ্গলিপি ছিল ৬৪ লিপি বর্গের মধ্যে ৫ম লিপি বর্গের। তাহলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে বুদ্ধের জন্মের পূর্বেই বঙ্গলিপিসহ অন্যান্য লিপির অস্তিত্ব ছিল।

অতএব ধারণা করা যায় বঙ্গলিপি অন্ততপক্ষে খৃস্টপূর্ব এক দেড় হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল যা দ্রাবিড় বঙ্গ জাতির উদ্ভব কালের প্রায় সমসাময়িক। গৌতম বুদ্ধের জীবনীগ্রন্থ ললিত বিস্তরে যে ৬৪টি বর্ণের তথ্য রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে ২১টি লিপি বর্গ শনাক্ত করা যায়।

www.pathagar.com

এগুলো হল ১. ব্রাহ্ম, ২. খরোস্তী, ৩. অঙ্গলিপি, ৪. বঙ্গলিপি, ৫. মাগধী লিপি, ৬. শকরী লিপি, ৭. দ্রাবিড় লিপি, ৮. কানাড়ী লিপি, ৯. দক্ষিণী লিপি, ১০. দারদ [কাশ্মিরী] লিপি, ১১. খস লিপি, ১২. চীনা লিপি, ১৩. হুন লিপি, ১৪. দেব লিপি, ১৫. চক্রলিপি (উড়িয়া লিপি), ১৬. উত্তর কুরু-লিপি, ১৭. পূর্ব বিদেহ (গৌড়াদি লিপি), ১৮, গণনাবর্ত লিপি, ১৯, যবদ্দেমত্তা পদসন্ধি লিপি (যব দ্বীপীয় লিপি) ২০. শকারী লিপি, ২১. পুষ্করশারী বা পুষ্কর লিপি.

উল্লেখ্য, ১৪তম লিপি দেব লিপি যা দেব-নাগরী বলে গণ্য করা যায়। ফলে এই ১৪তম লিপি থেকে ৪র্থ বা ৫ম তম লিপি বর্গ বঙ্গ-লিপির নিশ্চয় উদ্ভব হয়নি। বঙ্গ-লিপি দেব নাগরীর পূর্বের লিপি। তবে ললিত বিস্তরে বর্ণিত ৬৪ প্রকার লিপি বর্গের অধিকাংশই বর্তমানে নেই। বর্ণগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য হয়েছে মূলতঃ বৃত্ত, ত্রিভুজ, কোণ, রেখা এবং বিন্দুর সম্প্রসারণ থেকে।

অন্যদিকে দেখা যায়, বাংলা-বর্ণমালার প্রাচীন আকার ও চরিত্র নিয়ে 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্র', 'কাধিনুতন্ত্র' ও 'ভূতডামর' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রচুর বর্ণনাময় কাব্য রয়েছে।

সেমেটিক : আরবী ভাষাই বঙ্গ ভাষার আদি পিতা

ভারতের দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের তামিল ভাষার সাথে বাংলাভাষার একটি ঐক্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আবার তামিল ভাষা মূল যেহেতু সেমিটিক আরবী ভাষা সে হিসেবে বাংলার মূলেও আরবী ভাষা রয়েছে। তামিল ভাষার মত বাংলা ভাষার অক্ষরও খৃষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের পূর্বের আরবী থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। তবে তামিল ভাষা এবং বাংলা ভাষার মধ্যে আলাদা চরিত্র রয়েছে ফলে এরা আলাদা ভাষা হিসেবে এখনও বিদ্যমান।

শ্রী অক্ষয় কুমার দত্তের লেখা ভারত বর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ের গ্রন্থের ৪৯নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ বেদ সংহিতায় তাহারাই (বাঙ্গালীরাই) দস্যু বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাদের [বাঙ্গালীদের] ও দ্রাবিড় ভাষীদের ভাষা এরূপ দূর সম্বন্ধ যে ঐ উভয় জাতি ভারত বর্ষে আসিয়াও একত্র সংশ্লিষ্ট ছিল এমন বোধ হয় না, তবে ঐ উভয়ে আর্যবংশীয় নহে, কোন তুরানি [আরব] বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইমাত্র বলিতে পারা যায়।

দ্রাবিড়রাই সেমিটিক এবং সেমিটিকরা আরবীয়। এ মতই বলিষ্ঠ হয় ঐতিহাসিক ফিলিপ কে, হিট্টির History of the Arabs, page-19, গ্রন্থে।

"Arabian was the cradle land of the Semitic race, where was the original home of this people? Different hypothesis have been worked but by various scholars'. There are those who considering the broad ethnic relationship between Semites and Hemet's hold that Eastern Africa was the original home. Others influenced by old testament traditions, maintoin that Mesopotamia provided the first abode, but arguments, in favour of the Arabian peninsula considered in their cumulative effect seems most plausible.

www.pathagar.com

নাজিরুল ইসলাম মুহাম্মাদ সুফিয়ান তাঁর রচিত 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন– "ডক্টর আব্বাস ফারুকীর 'The Bahrain island' পুস্তকে দেখা যায় আরব ইতিহাস অনুসারে দিলমুনরা খামুদ গোত্রের মানুষ। বাবিলনীয় উৎকীর্ণ লিপিতে তাহাদের তিলমুনা বালিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিলমুনীদের সুমেরীয় নাম নিতুক-কি তবে নিতুক কির সহিত সুমেরীয়রা বাহরাইনের অধিবাসীরা দিলমুন নামেও অভিহিত হইত। তখনকার দিনে বাহরাইনের রাজধানী ছিল তিলমুন।"

কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় দামিল নামের উল্লেখ দেখা যায়। এই দামিলই দাক্ষিণাত্যের তামিল এবং সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় একই গোত্রের মানুষ। তাই একথা বলা যায় আরবের দিলমুন ও তিলমুনরা দাক্ষিণাত্যের দামিল ও তালিরা মূলত একই সেমিটিক গোত্রের মানুষ।

The Indian History Congress ও ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং K.A. Nila Kantha Shastri সম্পাদিত "Comprehensive History of India" Vol-11 [325 B.c-A./d. 300] গ্রন্থের একুশ অধ্যায়ের ৬৭৯ পৃষ্ঠায় Fraderick Bodomer এর Loan of language গ্রন্থের ৪৯ উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে তামিলরা দ্রাবিড় জাতি এবং এরা আরবের অধিবাসী ছিল এব তাদের ভাষা আরবী – সেমিটিক আরবী।"

তামিল দ্রাবিড় এবং বঙ্গের বাঙ্গালী একই সূত্র থেকে উদ্ভূত– এদের মূল সেমেটিক আরবী। বঙ্গভাষাভাষী বাংলা সাম্রাজ্যেও দ্রাবিড় জাতির শাসন ছিল। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন– "আর্যসভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইবার বহুপূর্ব সময় হইতে বঙ্গ নামে দ্রাবিড় জাতির একটি রাজ্য ছিল এবং সে দেশে হেয় বা হীন বীর্য ছিল না। ইহারা এখন বিদ্যা বুদ্ধিতে এবং চরিত্র গৌরবে কাহারো অপেক্ষা হীন নহেন। সমগ্র ভারতবর্ষ এখন আর্যদ্রাবিড় মিশ্রিত। কাজেই একমাত্র আর্যের কথায় ভারত ইতিহাস আবদ্ধ বা শেষ হইতে পারে না। দ্রাবিড় কাহিনী ভারত ইতিহাসের মুখ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"(বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, পৃষ্ঠা-৪৩৩, মাসিক নব্য ভারত, কার্তিক ১৩১৭ , ৭ম সংখ্যা)

বাংলা ভাষায় অনেক আরবী শব্দ রয়েছে। কেন আরবী বাংলায় রয়েছে এর কারণ উল্লেখে অনেকে মনে করেন এদেশে দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের ফলে আরবী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়।

ভারতে ইসলামের আগমনের বহু পূর্বে এমনকি আরবে ইসলাম ধর্ম আগমনেরও বহু পূর্বে আরবী ভাষা ভাষী আরব বণিকেরা, নাবিকেরা ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে আগমন করে এবং কেউ কেউ বসতিও স্থাপন করে। এজন্য আরবী ভাষা ভারতীয় ভাষায় অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাছাড়া ভারতীয় দ্রাবিড়দের প্রাচীন ভাষাও ছিল সেমেটিক আরবী। এ ভাষা থেকেই পরবর্তীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।

Arabic : The myths of all languages, by Abdul Haque

www.pathagar.com

vidyarthi, page-16, The Islamic Review, Vol, XLVii, No 1 January 159, গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়: Thousands of years ago, the inhabitants of Indian spoke and understood Arabic. Arabic was disfigured into various forms and gave rise to the hundreds of languages we now find in India. The founder of Arya Samaj movement Suami.

Dayanand, has stated in his book, Satyarth Parkahs, That Kurus and pandwas discussed confidasial Matters in Arabic. The words for mountains, rivers, towns, heaven, earth, names of relations, names of posts, exclamation of Happiness, bedding and coverings, house etc. are all in Arabic. The only difference in most cases is that of the words are read from right to left, they sounds Arabic and if they are read from left to right sound samskirt.

অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুজিত ও বলিত। আরবীকে নানাপ্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে আমরা শত শত ভাষা দেখিতে পাই, আরবী ভাষা হইতেই তৎসমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তাহার সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরু ও পাণ্ডবগণ গোপনীয় বিষয়সমূহ আরবীতে আলোচনা করিতেন। পর্বতসমূহ, নদীসমূহ, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয়দের নাম সমূহ, পদ সমূহের নাম সমূহ, সুখের উচ্ছ্বাস বিছানা, চাদর সমূহ বাড়ী, ইত্যাদি শব্দসমূহ সমস্তই ছিল আরবীতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল যে শব্দগুলি যদি ডান দিক হইতে বাম দিকে পড়া হয় তাহা হইলে আরবী ধ্বনিত হয়, আর শব্দগুলি যদি বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়া হয় তাহালে সংস্কৃত ধ্বনিত হয়।

অতএব বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পূর্ব বর্ণিত আরব জাতি সম্ভবত আর্যপূর্ব একটি জাতি হওয়াতেই তাদের মূলের ভাষা প্রকৃতপক্ষে আরবী ছিল এবং এই আরবী থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

মূলত সকল ভাষার মধ্যে কিছু সাধারণ সাদৃশ্য বাচক শব্দ রয়েছে এসব শব্দই প্রমাণ করে ভাষা পূর্বে একটিই ছিল। এ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার দত্তের উপক্রমনিকা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন : "এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কতগুলি শব্দের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এককালে উহারা সকলেই একভাষী ও এক জাতি নিবিষ্ট না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না।"

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দ

বাংলা ভাষার আদি উৎপত্তি স্থল সেমেটিক আরবী সেমেটিক ভাষা। বঙ্গ বা বাংলা নামটি কত প্রাচীন বা কোথায় এর উল্লেখ রয়েছে সে সম্বন্ধে জানা দরকার।

www.pathagar.com

শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন– "কিন্তু বঙ্গ শব্দের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে দেখতে পাই।... অথর্ব পরিশিষ্টে দেশবাচী বঙ্গ শব্দের প্রয়োগ আছে তারপর দেশ সূচক বঙ্গ শব্দের এইটিই সর্বপ্রাচীন প্রয়োগ।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬৩১)

বাংলাদেশের প্রাচীন ভূমির ও স্থানিক বর্ণনায় জানা যায় গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপ ..... ছিল এক অনাবাদী জঙ্গলময় ভূমি। গঙ্গার অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান এর আরবী হচ্ছে 'বাদিয়াতু কানক (কান্‌ক)'

আরবী বাদিয়া অর্থ জঙ্গলময় স্থান।

বাদিয়াতু বা বাদিয় = জঙ্গলময় স্থান।

কান্‌ক বা কাংক = গঙ্গানদী

অর্থাৎ বাদিয়া কানক > বাদিয় কান্‌ক (কাংক)

বন্‌ক (বানক) > বান্‌ক (বংক) > বন্‌গ (বংগ)> বঙ্গ।

বাংলা নামের উৎপত্তিও আরবী থেকে।

গঙ্গা নদীর উজানের জঙ্গলময় স্থান এর আরবী হল বাদিয়াতু কাকেল আলিয়াহ। বাদিয়াতু কানকেল আলিয়াহ হয়েছে বানকালিয়াহ।

বানকালিয়াহ থেকেই বাগনালা ড়বাঙ্গলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

বাদিয়া = বন জঙ্গলময় স্থান

কানক = গঙ্গানদী

আলিয়াহ = নদীর উজান স্রোতের ধারা

বাঙ্গলার বিবর্তিত রূপ ঃ

বাদিয়াতু কানকেল আলিয়াহ> বাদিয়া কানকেল আলিয়াহ> (প্রাকৃত উচ্চারণ মতে দুই স্বর বর্ণ মধ্যস্থিত ক. গ, চ, ত, দ, প য় লোপ পায়] বান্‌ক + আলিয়াহ]উজান স্রোত ধারা[বান কালিয়াহ > বাক্কালাহ > বানকালা (বাংকালা) বাঙ্কালা)> বান্‌গালা> বাংগালা> বাঙ্গালা> বাংলা।

অতএব দেখা যাচ্ছে খোদ বঙ্গ এবং বাংলা শব্দের উৎপত্তিই আরবী ভাষা থেকেই। বাকাঁলা বা বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার আমরা একটি প্রাচীন গ্রাম্য গীতিতে দেখতে পাই। যথা :

পদ্মা মেঘনার ভাটির লগে
সাইগরেতে যাই
বাঁকালা আলের বঙ্গ,]আমরা[
গুন টানি হাল বাই।
ক্ষেতে ধানে মন না টানে
বাইন্যা হইবার চাই,
সেইনা চাইয়া নাও ভাসাইয়া
উজান ও ভাই টাই।
জাহাজ বানাই ভাটিতে যাই

www.pathagar.com

ক্ষেতে বান্ধি চাল
বাদ কাইটা বসত আইটা
মারিরে গয়াল।
আরে– হাতি বান্ধে পাতারে বান্ধে
বান্ধেরে জাঙ্গাল
গাঙ্গের পাড়ে হাঙর মারে
বাঘাইয়া বাঙ্গাল।
(সংগ্রহ)

আরও কিছু স্থানের আরবী মূলের নাম এবং ব্যাখ্যা :

১. বাঁকুড়া

বাদিয় কান্‌ক> বানক (বাংক) + উড়া (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার 'উড়' বন্দরের নামানুসারে 'উড়া') = বানকুড়া (বাংকুড়া) > বাঁকুড়া

২. বগুড়া

বন্‌ক বাদিয় কান্‌ক > বানক > বনক (বংক> বঁক) > বংগ + উড়া = বঁগুড়া

৩. বকচর (যশোরের পাশে)

বাদিয়া কান্‌ক > বানক > বন্‌ক (বংক > বঁক) = বঁক + চর = বকচর

৪. ঢাকা

বাদিয়া কান্‌ক> বাদ্যাকাঁ> বাদক > বেতকা > বাদাকা > দাবাক > দবাকা (DEVAKA) > দ্বাকা> দাকা> ডাকা> ঢাকা।

.....In the 4th century B.C. when Guptyas ruled this contry, Dhaka. was Known, as DEVAKA' [page-101, of old Dhaka, S. M. Taifoor]

৫. সোনার গাঁ : আরবী শাতিল কাংক।

শাতিল কাংক (গঙ্গ নদীর কিনারা) > সাতুল কাংক > সাতুল কাংক > সানুট কাংক (এই সানুট কাংক শব্দটিকেই ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরীতে সঙ্কট বলে উল্লেখ করেছেন) > সানুর কাংক> সানুর গান্‌গ (গাঙ্গ)> সোনার গান্‌গ (গাঙ্গ) > সোনারগাঁ

৬. চিটাগাং (চট্টগ্রাম) : শাতিল কাংক আরবী।

শাতিল কাংক (গঙ্গানদীর কিনারা) সাতিল গাংগ > চাটিলগাং > চাটি গাং (চটিগং, চাটগা) > চিটাগং (ইংরেজীতে)।

৭. আরাকান

আরবী ইরাকের বহুবচন ইরাকিনা ইরাকিন > ইরাকানা > এরাকানা > আরাকান (ইরাকীদের)

৮. আসাম

সিরিয়ার প্রাচীন নাম 'আল-সাম'। এই আলসাম থেকেই আসাম নামের উৎপত্তি।
আলসাম> আস সাম> আসাম

www.pathagar.com

আরবী ভাষায় স-এর পূর্ববর্তী বর্ণ ল বর্ণ লোপ পেয়ে ল-এর পরবর্তী বর্ণ স-এর দ্বিত্ব হয়।
৯. নেপাল। আরবী নেবাল শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। নেবাল অর্থ টিলা।
নেবাল > নেপাল।
১০. ভূটান। ওয়াতান আরবী শব্দ থেকেই ভূটান শব্দের উৎপত্তি। ওয়াতান অর্থ স্বদেশা
ওয়াতান > ওতান > বোতান > বুতান > বুটান > ভূটান।
১১. সিকিম।
সেখেম আরবী শব্দ থেকেই সিকিম শব্দের উৎপত্তি।
সেখেম > সিখিম > সিকিম
১২. তিব্বত। তোবায়েত আরবী শব্দ থেকেই তিব্বত শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ উচ্চস্থান।
তোবায়েত > তাব্বেত > তব্বত > তিব্বত
১৩. সাভার ।'সাবা' একটি আরবি জাতির নামের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।
সাবা + উর = সাবউর > সাবুর > সাবার > সাভার।
১৪. কেন্দুয়া ।কিন্দ, সিরিয়া ও আরবের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। কিন্দ + উয়া > কিন্দুয়া > কেন্দুয়া। কেন্দুয়া নেত্রোকানার একটি থানার নাম।
১৫. হারাপা > হরপ্পা। বেবিলনের রাজা হাম্মুরাব্বির (খৃ. পু, ১৭৯১- ১৯৪৯) নাম থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।
হাম্মুরাব্বি > হাম্মুরাপ্পি > হাম্মুরাপ্পা > হামুরাপ্পা (হাম+উ+রাপ্পা) > হাউরাপ্পা > হারাপ্পা (হরপ্পা)।
১৬. মহেঞ্জোদারো। আরবের কিন্দ সম্প্রদায়ের লোকেরা সিন্ধুতে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার পতন করেছিলেন।
নামের উৎপত্তি : মা কিন্দ উরুক (আররবীতে) অর্থাৎ কিন্দদের উরুক নামের বন্দর)> মা কিন্দ উরু > মাখিন্দ উরু> মাহিন্দ আরা> মাহেন্দজারা (বাংলাভাষার পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ–৭৬) > মহেঞ্জোদারো।
আসলে বাংলাভাষা অনেক প্রাচীন। 'বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা বলে চেনাই যায় না। (বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃ-৯৮)
রবীন্দ্রাথ ঠাকুর), "এই ভাষা আজো আপনি অঙ্গলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানেনা। (ঐ, পৃষ্ঠা-৯) , রবীন্দ্রনাথ উল্লেখিত বাংলা ভাষা আদি জন্মভূমি সুদূর পশ্চিমের যে আরব দেশ ও আরবী ভাষা তা আর বেশী করার অবকাশ রাখে না।

সেই প্রাচীন প্রথম বাংলাভাষা, বাংলা বর্ণ লিপি না জানি কেমন ছিল।

সে যা হোক " প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপি সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তখনকার বাংলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা নি:সন্দেহে জানিবার উপায় নাই।" (পৃ–১৯, বিশ্বকোষ, ১৩১৪ বাংলা, আষ্টাদশ ভাগ)

www.pathagar.com

বর্তমানে বহু বিবর্তন, ... মধ্য দিয়ে আজকের বাংলা ভাষা অনেক গতিশীল, অমলিন। এর ভেতরে ভেতরে যে শেকড়ের উসখুস দেখা যায় তা এর সৌন্দর্য প্রকাশ করে-এর মৌলিকত্ব ঘোষণা করে। এখনও এর শরীরে প্রচুর মৌলিক আরবী শব্দ রয়েছে। ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরী কৃত বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকা থেকে জানা যায় "Multitudes of words originally Persian and Arabic are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered enriching rather than corruption the Bengali language" অর্থাৎ সাধারণ আলাপ আলোচনার মূলগতভাবে বহু সংখ্যক পার্সী আরবী শব্দ অপরিবর্তনীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। যা বাংলাভাষাকে বিকৃত অপেক্ষা বরং সমৃদ্ধ করে বলে বিবেচনা করা উচিত।

বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ রয়েছে যা আমরা বাংলা বলে জানি। কিছু উদ্ধৃতি,

	আরবী শব্দ	অর্থ	বাংলা
১.	বাহ্	যথেষ্ট	বাহ্
২.	বানা	তৈরি করা	বানানো
৩	ফাও	শূন্য, ফাকা	ফাও
৪.	শাত	সাথে, কিনারে	সাথে
৫.	উজান	উজান	উজান
৬.	ওযাতি, ভাতি	ভাটি,	ভাটি
৭.	বদিয়	বন, জঙ্গল	বাদা, বাদ্দা
৮.	নবাক, নওক	নৌকা	নৌকা
৯.	মাস্তুল	মাস্তুল	মাস্তুল
১০.	হাইল	হাইল	হাইল
১১.	অলিয়াহ	উজানের কিনার বা আইল	আল, ক্ষেতের আল
১২.	কান্‌ক	গঙ্গানদী	গঙ্গা
১৩.	তুকান, দুকান	দোকান	দোকান
১৩.	কলম	কলম	কলম
১৪.	বানি	জীবন সঞ্জিবনী	পানি
১৬.	বাত	কোন বস্তুর দিকে ঝুকে পড়া	ভাত, ভাতের দিকে
১৭.	গুছাল	গোসল/স্নান	গোছল
১৮.	দওর	বারবার জোরে,	দৌড়
১৯.	গুমান	আবৃত করা, গোপনকরা	ঘুমানো
২০.	সোওয়া	কাজের শেষ, লম্বা হয়ে শোয়া	শোয়া
২১.	সুজা	কানে শুনা	শুনা
২২.	বশা	ওপর হতে নিচে পড়া	বসা
২৩.	আশ-এ	কাছে থাকা, আসা	আসা
২৪.	খাস	আসল	ঘাস

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার প্রথম লড়াই

বাংলা ভাষাই বাঙ্গালীদের কথ্য ভাষা। এ ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধারা আলোচনার পর বাংলা ভাষার সাথে আর্য ও আর্য ভাষার লড়াই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। বহিরাগত আর্যরা খৃষ্ট জন্মের দেড় হাজার বছর আগে দার-এ আবির বা ভারত বর্ষে প্রবেশ করে। এ সময় স্থানীয় অধিবাসী দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের লড়াই শুরু হয়।

সেমিটিক সভ্যতার উত্তরসূরী দ্রাবিড়রা এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিল। তারা মূর্তিপূজা বা পৌত্তিলিকতার বিরোধী ছিল। আর্যরা একে তো বহিরাগত তার ওপর তারা ছিল মুশরিক বা বহু স্রষ্টা পূজারী। স্বভাবতই দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে আর্যরা বিজয় লাভ করে। আর্যরা সারা ভারত ক্রমে ক্রমে দখলের পর বাংলা বিজয়ের জন্য সামরিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। এক পর্যায়ে আক্রমণকারী আর্যরা সমরকৌশলী যোদ্ধাজাতি বাঙ্গালীদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু বলেন—"প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি স্বরস্বতী তীর হইতে (ভাগলপুর) সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ সদানীরার অপর পাড়ে অবস্থিত বঙ্গ দেশের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই।"[১১]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ও অভিমত পেশ করেন যে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করতে পারেনি। আর্যরা বাঙ্গালীদের সন্মখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে না পেরে তারা কৌশল পরিবর্তন করে। আর্যরা বাংলায় ধর্ম প্রচারের নামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ উল্লেখ করেন– "আর্যরা সদানীরা বা করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদানীরার পূর্ব তীরে অপেক্ষমান বাঙ্গালী বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে তাদের দেশটা দখল করা সম্ভবপর নয়। সমরাভিযানে আর্যরা থেমে গিয়েছিল সেখানেই। কিন্তু কালক্রমে বাঙালীদের দেশে আর্যদের সুদীর্ঘ কালব্যাপী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান? সে অভিযান ঠিকই চলছে, আর তাতে শেষ পর্যন্ত বিজয়ীও হয়েছিল আর্যরা। সে বিজয় ধর্মীয় বিজয়, সে বিজয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয়। আর ধর্মীয় বিজয় ও কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতার বিজয় হয়ে গেলে তো বাদবাকী দেশ বিজয়ের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আর্যদের দ্বারা তাই হয়েছিল। বাংলায় আর্যরা বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেছিল এমনি ঘোর পথে।"[১২]

বাংলা সাধারণ আর্যদের প্রবেশ আর্য ব্রাহ্মণেরা ধর্মীয় ফতোয়ার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করেছিল। আর তা করেছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভয়ে ভীত হয়েই। আর্যদের মনু সংহিতায় বিধান দেওয়া হল–

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গসৌরাষ্ট্র মগধেষুচ। তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মর্হতি।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ]উড়িষ্যা[সৌরাষ্ট্র, মগধ]বিহার[দেশের কেবল মাত্র তীর্থ যাত্রা ছাড়া অন্য কোন কারণে গমন করলে সে পতিত গণ্য হবে এবং পুনরায় সংস্কার ছাড়া জাতে ঠাঁই পাবে না। এর ফলে আর্যদের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় প্রবেশ করেনি। আর্য ব্রাহ্মণেরা বাংলা প্রবেশ করে ধর্ম প্রচার শুরু করে এবং বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতে থাকে। আর্য সাহিত্য ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ প্রভৃতিতে সুর ও অসূরের লড়াই এর কথা বিধৃত হয়েছে। সেখানে বাঙ্গালীদের অসূর বা রাক্ষস, অদেব, দাস, পক্ষী প্রভৃতি উপনামে গালি দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু লিখেছেন, "ঐতরেয় আরণ্যক বলেন, বঙ্গবাসীরা অবোধ ভাষাভাষী পক্ষী জাতীয় এবং তাহার ভাষ্যকার তাহার উপর আর এক গ্রাম সুর চড়াইয়া তাহাদিগকে পিচাশ, রাক্ষস, অসূর প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন, স্বয়ং মনু পর্যন্ত বিধান দিয়েছেন, তীর্থ যাত্রা ভিন্ন এ ম্লেচ্ছ দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[১৩]

আর্যরা বাঙ্গালী দ্রাবিড়দের ম্লেচ্ছ যবন অসূর বলে গালিগালাজ করত। তাদের সাথে মেলামেশা না করতে, তাদের ভাষা বাংলা ভাষা না বলতে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করত। আর্যরা দ্রাবিড় বাঙ্গালীদের সন্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারার কারণে তাদেরকে এত ঘৃণা করত। পাছে আর্য জাতির অপেক্ষাকৃত সরল ও সাধারণ মানুষেরা বাঙ্গালীদের সংশ্রবে এসে বাঙ্গালী হয়ে যায়, মুসলিম হয়ে যায় এ কারণে তারা ধর্মীয় কঠিন বিধিবিধান জারি করেছে। পরাক্রমশালী বাঙ্গালী মুসলিম জাতির গৌরবময় ইতিহাস, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন পুরান গ্রন্থ তারা রচনা করেনি। এটা মূলত আর্যদের ঘৃণা ও ষড়যন্ত্রের কারণ। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "বিদেশী ইতিহাসকারেরা যে গংগরিড়ী জাতির সৌন্দর্য ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে উল্লেখ করল, মহাকবি ভার্জিল যে জাতির শৌর্যবীর্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন এবং পাঁচশ বছরেরও বেশী কাল যারা বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালালেন, এদশের পুরাণ বা অন্য গ্রন্থে তাদের উল্লেখ নেই।"[১৫]

প্রখ্যাত বৌদ্ধ শাসক সম্রাট অশোকের পর বাংলা জনপদ ও বাংলা ভাষার ওপর আর্য ব্রাহ্মণদের চরম অবজ্ঞা ও নির্যাতন শুরু হয়। গুপ্ত শাসনামলে বাংলা ভাষার ওপর, বাঙ্গালী সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন শুরু হয়। গুপ্ত রাজারা ধর্মে কর্মে ছিল আর্য ব্রাহ্মণাশ্রয়ী। ড. নিহার রঞ্জন রায় এ প্রসংগে বলেন-"তারই ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং এরাই হয়ে ওঠেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নিয়ন্তা। এদের অবলম্বন করেই বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতির স্রোত সবেগে আছড়ে পড়ল। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ কথা, বিচিত্র লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি সেই স্রোতের মুখে ভেসে এসে বাংলায় প্রাচীনতম ধর্ম, সংস্কৃতি ও লোক-বাহিনীকে এক প্রান্তে ঠেলে নামিয়ে দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলোর ভাষা হল আর্য ভাষা, ধর্মহল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। আর্য আদর্শ অনুযায়ী সাংস্কৃতিক আদল গড়ে উঠল।[১৬]

www.pathagar.com

ড. নীহার রঞ্জনের লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে দ্রাবিড় বাঙ্গালীদের বাংলায় ধর্ম ছিল সেমেটিক জাতীয় একত্ববাদী, যা বৈদিক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে আলাদা যা বৌদ্ধ ধর্মও নয় আবার জৈন ধর্মও নয়। তাদের ভাষাও ছিল আর্য ভাষা থেকে আলাদা বাঙ্গালী ভাষা বা বাংলা ভাষা। এই ভাষা সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য, লোককথা, পুরানা সব কিছু ছিল; কিন্তু গুপ্ত রাজাদের আগ্রাসনে বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে থাকে।

ড. নীহার রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' আদিপর্ব থেকে সুস্পষ্ট জানা যায়, "গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বাধা পড়ে বাংলাদেশেও সর্ব ভারতীয় [ব্রহ্মণ্য] ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে আছড়ে পড়লে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন, এরা কেউ ঋগ্বেদীয়, কেউ বাজসনেয়ী, শাখাব্যয়ী, যাজুর্বেদীয়, কেউবা সামবেদীয়, কারও গোত্র কাশ্ব বা ভার্গব বা কাশ্বপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা ভাৎস্য বা কৌণ্ডিন্য। মন্দির তৈরী বিগ্রহের পুজো ইত্যাদির জন্য, গ্রামে বসবাসের জন্য ব্রাহ্মণদের জমিদান হতে লাগল। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌছল।"[১৭]

বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার ওপর আর্য ব্রাহ্মণ ও আর্য হিন্দু পৌত্তলিকদের ঘৃণার কথা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও উল্লেখ করেছেন। ২/৫/১৯৪৮ইং তারিখে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলনে রংপুর জেলার ধলগাছ [সৈয়দপুর] অধিবেশনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সভাপতির যে অভিভাষণটি দেন তা বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত শহীদুল্লাহ রচনাবলীতে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কার' শিরনামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে শহীদুল্লাহ উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'যে মানব অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে তার ঠাঁই হবে রৌরব নরকে।'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা

বংগ দ্রাবিড় বা গংগরিড়ী জাতিই আধুনিক বাঙ্গালী জাতির পূর্ব পুরুষ। দ্রাবিড়রা যেহেতু সেমেটিক তারা স্বভাবতই এক স্রষ্টাবাদী, অপৌত্তলিক, মুসলিম। আর্য সংস্কৃতির ধর্মীয় আগ্রাসনে, গুপ্ত আমলের আর্যীকরণে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক ক্ষতি হয়। সাথে সাথে একেশ্বরবাদী দ্রাবিড়দের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে আর্য ধর্মে বিবর্তিত হয়। পাল শাসনামলে সুদূর আরব থেকে বিভিন্ন সাহাবী ও ধর্মীয় নেতা বাংলায় আগমন করেন এবং একেশ্বরবাদী বংগ দ্রাবিড়দের তাদের হারিয়ে যাওয়া ধর্ম বিশ্বাসে ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। ফলে বিবর্তিত তৌহিদবাদী বংগ দ্রাবিড় বাঙ্গালীরা পুনরায় স্ববিশ্বাসে স্বধর্মে ফিরে আসে। তারা পূর্ণ মুসলিম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেন শাসকদের অত্যাচার, অর্থনৈতিক নিপীড়ন, জাতি ভেদ, শ্রেণী ভেদের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়। বিপ্লবী বাঙ্গালীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির প্রহর গুণতে থাকে। এ সময়ে বাংলায় মুসলিম ধর্ম ও রাষ্ট্র নেতাদের সামরিক বিজয় ঘটে। বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে বাংলা বিজয় করেন। সমগ্র বাংলায় তখন মুসলিম ঐতিহ্য ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ড, নীহার রঞ্জন রায় বলেন, "ইসলাম প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিছু লোক বোধ হয় বাংলার কোথাও কোথাও সেই প্রাকৃত ধর্মী বৌদ্ধ

www.pathagar.com

সংস্কৃতের ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, সেক-শুভোদয়া গন্থের ভাষায় তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।"

বাঙ্গালী মুসলিম জনগণ ও শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে লালন পালন করেছিল। তাদের শাসনকালেই এই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। পাল বৌদ্ধ শাসনামলে যে প্রাকৃত আদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুনঃ সৃষ্টি হয় মুসলিম জনতা তাকে আর্য-হিন্দু পৌত্তলিক আগ্রাসন থেকে হেফাজত করেছে এবং তাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। বাংলার মুসলিম শাসকেরা বিশেষত স্বাধীন সুলতানগণ বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র গঠন করেন। এর পূর্বে বাংলা জনপদের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি ছিল না।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) সর্ব প্রথম বংগ, গৌড়, রাঢ়, পুন্ড্র, সমতট প্রভৃতি জনপদ একত্রিত করে বাংলা রাষ্ট্রের পত্তন করেন। তিনিই প্রকৃত অর্থে বাংলা রাষ্ট্রের প্রথম স্থপতি-নৃপতি। তিনি শাহ-ই-বাঙ্গালাহ ও শাহ-ই-বাঙ্গালী উপাধী নিয়ে বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র শাসন করেন। ড. এম. এ. রহীম এ প্রসঙ্গে বলেন– "মুসলিম শাসনের আগে 'বাংলা' নামে কোন দেশ ছিল না। 'বাংলা' নামটি এদেশের জন্য অপরিচিত ছিল। এদেশের অধিবাসীদের জন্য 'বাংগালী' পরিচয় কিংবা তাদের ভাষার বাংলা নামকরণ তখনো হয়নি। মুসলিম শাসকরাই বাংলার সবগুলি অঞ্চলকে একটি রাজনৈতিক ঐক্যে সংহত করেন এবং এই নব-সংগঠিত অঞ্চলের 'বাংলা' নাম ইতিহাসে প্রতিষ্টিত করেন।"[২১]

মুসলিম জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতি ও মুসলিম শাসকদের বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন– "হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজ দরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেত না। এমনিভাবে মুসলমান শাসক ও আমীর ওমরাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররাও বাঙ্গালী কবিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের অনুপ্রাণিত হন।"[২২]

মুসলিম শাসনামলে 'হিন্দু পৌত্তিলিক' সাহিত্য, বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সমভাবে বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পৌত্তলিক আর্য হিন্দুরা তখন আর বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করার, পরিত্যাগ করার সাহস করেনি বরং সুযোগ গ্রহণ করে– তারা বাংলা ভাষায় তাদের ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে। তারা মুসলিম সুলতানদের অর্থানুকূল্যে রামায়ণ, মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে। আর্য হিন্দুরা এ সময়ে কৌশলে বাংলা ভাষায় ব্রজবুলি, পাঞ্চালী, মনসার গান, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি করেন। "অপরদিকে শাহ মোহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দিন, কবি মুজাম্মিল, চাঁদ কাজী, শেখ কবির, আফজাল আলি, সাবিরিদ খান, দোনা গাজী, দৌলত উজির বাহরাম খান, শেখ ফয়জুল্লাহ, মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, শেখ পরান, হাজী মুহম্মদ নসরুল্লাহ খাঁ, মুম্মদ খান, মুহম্মদ আবদুল হাকীম, দৌলত কাজী, কবি হায়াত মামুদ, আলাওল প্রভৃতি কবিকুল রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,কাহিনী কাব্য, নবী বংশ, রসূল বিজয়, গাজী বিজয়, গোরক্ষ বিজয়, রসূল নামা, জঙ্গ নামা, নীতিশাস্ত্র, নসীহৎ নামা, মর্সিয়া, মারফতী গান, পদাবলী, নূর নামা ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের সাহিত্য দিয়ে মধ্যযুগের রসিক চিত্তকে মাতিয়ে রেখেছিল। মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের হাতে বাংলা ভাষায় প্রথম রচিত হয় আশ্চর্য সুন্দর মানবিক প্রণয়োপাখ্যান পদ্মাবতী, লাইলী মজনু,

www.pathagar.com

মধুমালা ইত্যাদি।" (আসাদ বিন হাফিজ : বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ)

স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলা রাষ্ট্র জনপদের শাসকেরা ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা নিজেরা ফার্সি ভাষা ব্যবহার করতেন; কিন্তু এই শাসকেরাই ছিলেন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দানকারী মহানুভব শাসক। তারা বাংলা ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় খরচে সংস্কৃত ভাষার রামায়ণ মহাভারত বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর্য হিন্দুরা তখন আর বাংলা ভাষাকে অস্পৃশ্য ভাষা পক্ষী-ম্লেচ্ছ-ভাষা বলে অভিহিত করে রামায়ণ মহাভারত বাংলায় অনুবাদ থেকে বিরত থাকেনি তখন আর রৌরব নরকে পোড়ার ভয় করেনি।

বাংলার মুসলিম শাসকেরা মূলত অসাম্প্রদায়িক মুক্ত উদার ও সংস্কৃতবাদ ছিলেন। তারা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য সকলকে উদারভাবে সাহায্য করেছেন। বাংলার এই স্বাধীন সুলতানদের আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন করেন। তাদের অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সবদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্ব যেসব সুলতান বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।"[২৩]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি দান একমাত্র বাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে ঘটেছিল। বাংলা ভাষার উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন, মর্যাদা দান বাঙ্গালী মুসলিম শাসকদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়েছিল।

আর্য হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে তার উৎপত্তির কালে ঘৃণা করলেও পরবর্তীতে এ ভাষার প্রভাবকে তারা এড়াতে পারেনি বরং এ ভাষায় অবগাহিত হয়েছে এবং সুযোগে নিজ ধর্ম সংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটিয়েছে আর্য সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। মধ্য যুগের শেষ পাদে বাঙলা ভাষাকে অবশ্য আর্য হিন্দুরাই সমৃদ্ধশালী করেছে- এদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মোহিত লাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকেরাই প্রধান। বর্তমান সময়ে বাঙালী মুসলিম সাহিত্যেকেরা হৃৎগৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। যে ভাষাকে তারা একদিন পরিস্ফুটিত করেছিল, পরিস্নাত করেছিল, সে ভাষাতে এখন আবার তারা উচ্চতর শিখরে অবস্থান করছে। সৃষ্টি করছে অমর কাব্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য ইত্যাদি। উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, এয়াকুব আলী চৌধুরী, বেগম রোকেয়া, এস. ওয়াজেদ আলী, মুজাম্মেল হক, শাহাদাৎ হোসেন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, নজিবুর রহমান, ফররুখ আহমদ, আবু রুশদ, শাহেদ আলী, গোলাম মোস্তফা, বে-নজীর আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী অহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ, ড. আশরাফ সিদ্দীকী, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আবদুস সাত্তার, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, আবদুল

www.pathagar.com

মান্নান সৈয়দ, আল মুজাহিদী, আফজাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ প্রধান।

মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের আবার ফিরে যেতে হবে সমৃদ্ধময় অতীত ঐতিহ্যে-ইতিহাসের স্বর্ণ দ্বারে, খুঁজে বের করতে হবে মূল ভাষা, মূল বাংলা শব্দসম্ভার, পুঁথি সাহিত্য, বহমান লোকাচার-জীবন বোধ সমৃদ্ধ শব্দ অনুষঙ্গ- ফিরে যেতে হবে মূল ধারার কাছে। তবেই আত্মমুক্তি তবেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুদঘাটিত হীরকোজ্জ্বল রাজ তোরণের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

উপসংহার

বাংলা ভাষার উৎপত্তি আরবী থেকে। বাঙ্গালী এবং দ্রাবিড় জাতীর পূর্ব পুরুষেরা ছিল আরব জাতি। বুদ্ধের জীবনী 'ললিত বিস্তরে' বঙ্গ লিপির আলাদা উল্লেখ রয়েছে। যা প্রমাণ করে এ ভাষার এবং লিপির উদ্ভব খৃষ্টপূর্ব দেড় দুই হাজার পূর্বের। বাংলা ভাষার বাঁচার লড়াই শুরু হয়েছিল আর্য-ইরানীয় সংস্কৃতভাষী আর্যদের সাথে। এ সংগ্রামে বাংলাভাষা টিকেছিল।

গুপ্ত আমলে রাজা শশাঙ্কের সময়ে বাংলাভাষা, বাঙ্গালী ও বৌদ্ধরা আক্রান্ত হয়। পাল শাসনামলে এ ভাষার আবার ব্যাপক চর্চা হয়। চর্যাপদ কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

সেন আমলে আবার এ ভাষা সংস্কৃতভাষী ব্রাহ্মণদের রোষানলে পড়ে। স্বাধীন সুলতানী আমলে এ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ এবং আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে অনুদিত হতে থাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদ্বয়ের পূর্বে এ ভাষার দ্বিতীয় লড়াই শুরু হয় উর্দুভাষী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে। ১৯৪৮ সালে তমুদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনের সূচনা করে। এর নেতা ছিলেন প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, ড. নূরুল হক ভূঁইয়া, বিচারপতি আবদুর রহমান প্রমুখ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন তীব্রতা পায় ভাষার জন্য শহীদ হন বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার প্রমুখ। এ ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। আজ দেশ স্বাধীন। দৈশিক জাতীয়তায় আমরা বাংলাদেশী কিন্তু ভাষা পরিচয়ে আমরা বাঙ্গালী। মূলত বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী পরিচয়ে বিরোধ না থাকাই ভাল। বাংলাভাষা আমাদের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালিত হয় পৃথিবীর দেশে দেশে। এ ভাষাতেই আজ সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বমাপের সাহিত্য।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. বাংলা বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পৃ-২
২. বাংগালীর ইতিকথা ঃ আখতার ফারুখ, পৃ |৫০-৫২|
৩. চেপে রাখা ইতিহাস ঃ গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃ-৫৬
৪. চেপে রাখা ইতিহাস ঃ গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃ-৫৭
৫. চেপে রাখা ইতিহাস ঃ গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃ-৫৬-৫৭
৬. চেপে রাখা ইতিহাস ঃ গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃ-৩৩-৩৪
৭. বাংলা বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারাঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পৃ-২
৮. বাংলা বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারাঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পৃ-২
৯. বাংলা বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারাঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পৃ-২
১০. বাংলা বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারাঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পৃ-২

www.pathagar.com

১১. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯
১২. বাংলায় আর্যী করণ [প্রবন্ধ], দৈনিক ইনকিলাব, ৮ই আগস্ট, ১৯৮৬; আসকার ইবনে শাইখ।
১৩. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২য় সংস্করণ পৃ-২১। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু।
১৪. বাঙ্গালী ইতিকথা : আখতার ফারুক।
১৫. বাংলাদেশে ইতিহাস : রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
১৬. বাঙ্গালীর ইতিকথা : ড. নীহার রঞ্জন রায়
১৭. বাঙালীর ইতিকথা : ড. নীহার রঞ্জন রায় পৃ-১৩০
১৮. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১৯৮৬, পৃ-৭, ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
১৯. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১৯৮৬, পৃ-৭, ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
২০. শহীদুল্লাহ রচনাবলী ১ম খণ্ড : বাংলা একাডেমী, পৃ-১৯৬
২১. বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ড. এম. এ. রহীম, পৃ-৪৭০
২২. বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য : ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃ-৭৩-৭৫
২৩. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন প্রথম সংস্করণ, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়।
২৪. বাংলার মুল : আনিসুল হক চৌধুরী
২৫. বর্ণমালার উদ্ভব বিকাশ ও লিপি সভ্যতার ইতিবৃত্ত : দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা
২৬. বাংলা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস : এস.এম.লুৎফর রহমান।
২৭. বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা : শেকড়ের অনুষঙ্গ/হাসান আলীম : প্রেক্ষণ ভাষা দিবস স্মরণ সংখ্যা।

লেখক পরিচিতি : হাসান আলীম– বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

লেখা পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২০শে নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস

শরীফ আবদুল গোফরান

■

বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে মাতৃভাষা বাংলা ও সাহিত্য যেমন অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার তেমনি বাংলা সাহিত্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের স্মৃতিময় ইতিহাস। হাজার বছরেরও অধিক সময়ের বাঙ্গালী সমাজ, তাদের জীবনবোধ, ধর্ম, নৈতিকতা ও জীবন সংগ্রামের নিখুঁত ছবি জীবন্ত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায়। জন্ম থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্য কালপরিক্রমায় আজকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বাংলা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর একটি। জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর অষ্টম স্থানের অধিকারী। বাংলা সাহিত্য আজ গুণগত বিচারে যেমন সমৃদ্ধ, পরিসরের ব্যাপকতায়ও তেমনি বিস্তৃত ও বিশাল। পৃথিবীর উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের মতই বাংলা আজ সমৃদ্ধ, জীবন্ত ও মর্যাদার আসনে সমাসীন। বাংলা আজ একটি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ও অপর একটি দেশের অন্যতম ভাষা।

www.pathagar.com

প্রায় সাড়ে তেরশো বছর ধরে এ ভাষাটি সচল ও সজীব। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক দিকে যেমন প্রচুর বাধাবিপত্তি ও ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, আবার সাহায্য, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছে। এর মধ্যে মুসলমানদের অবদান সবার শীর্ষে। বস্তুত বাংলা ভাষার এ উৎকর্ষতা মুসলমানদের অপরিসীম ত্যাগ ও সাধনার ফসল।

এই ত্যাগ ও সাধনার কারণেই বাংলা আজকের যুগের একটি সপ্রাণ, সজীব, সচল, সমৃদ্ধ, সম্পদশালী ভাষা, প্রাণবন্ত ও জীবন্ত ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যও প্রাণবন্ত, সচল ও জীবন্ত সাহিত্য।

বিশ্বের যে কোন ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ ও আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়। সাহিত্য সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী হয় অন্য সাহিত্যের উপকরণ, সম্পদ আহরণ ও আত্মীকরণের মাধ্যমে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, পর্তুগীজ, ফ্রেন্স, ইংরেজী, ডয়েস (জার্মান) প্রভৃতি সুপ্রাচীন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ ও আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এসব ভাষার সাহিত্যোপকরণ, দর্শনতত্ত্ব প্রভৃতি আহরণ ও নিজদেহে আত্মীকরণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যও প্রাণবন্ত, সচল, জীবন্ত ও সমৃদ্ধ সাহিত্য রূপে বিশ্ব সাহিত্যাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। বস্তুত বাংলা ভাষা আজকের বিশ্বের একটি প্রাণবন্ত ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য একটি জীবন্ত সাহিত্য। আজকের বাংলা ভাষা যেমন সমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যও সম্পদশালী।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চা

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয় এবং মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলাসাহিত্য স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে আজ একথা দাবি করা সঙ্গত যে, আজকের বাংলা ভাষা মুসলমানী পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ ভাষা। সুতরাং এই ভাষা মুসলমানদেরই ভাষা। জন্ম যেখানেই হোকনা কেন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে এই অঞ্চলকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণকারী তুর্কী, মোগল, পাঠান এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। যুযোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করে এই ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে বিধায় এই ভাষা বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের ভাষা।

বাংলা কিভাবে মুসলমানের ভাষা হলো তা বুঝতে হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আমাদের জানা অপরিহার্য। অন্যদিকে জন্মগতভাবে প্রাণসমৃদ্ধ ও সচল ভাষাকে দুর্বোধ্য শব্দ সম্ভারে কন্টকিত করে অবোধ্য, অচল ও নিস্প্রাণ করে তোলার যে ষড়যন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল তা এখনো অব্যাহত রয়েছে সূক্ষ্মভাবে। জন্ম ও ক্রমাগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করা না গেলে ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা না গেলে এই ভাষা ও

www.pathagar.com

সাহিত্যের অবাধ গতি ও সচল ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা অমূলক নয়। ফলে বাংলা ভাষার সংরক্ষণ ও ভাষা আন্দোলনে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় কি ছিলো তা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার সংরক্ষণ ও স্বীকৃতি

বাংলা ভাষার সংরক্ষণ ও ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেমন অপরিসীম গুরুত্বের দাবীদার তেমনি বাংলাসাহিত্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের স্মৃতিময় ইতিহাস।

আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠকরা মনে করেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষার আদি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সরকারী কাজে তার ব্যবহার ব্রিটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলেই ঘটে। সম্ভবত ১৩৫১ সালে লোয়ার ও আপার বেঙ্গল তথা "বাঙ্গাল" ও গৌড় মিলিয়ে একটি একক দেশ গঠন করার সময় থেকে মুসলিম শাসকগণই বাংলা ভাষায় এমন অচিন্ত্যনীয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেন। মুসলিম আভিজাত শ্রেণীর এক বিরাট অংশ দীর্ঘকাল অব্যাহত ভাবে বাংলা ভাষার চর্চা করে এসেছেন।

(ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মারক : পৃষ্ঠা ৯৯)

এক সময় বহিরাগত যুদ্ধবিজয়ী শাসক শ্রেণী নিজেরা এবং তাদের সাথে আগত ফার্সী ভাষীরা এই উপমহাদেশের ভাষা–সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভে উৎসুক হন। তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এয়োদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ইসলামী তাত্ত্বিক কাজী রুকন উদ্দিন সমরকন্দী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু যোগ শাস্ত্র "অমৃতকুণ্ড" প্রথমে ফার্সী এবং পরে আরবীতে অনুবাদ করেন। অত:পর মুসলিম লেখকরা এগিয়ে আসেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায়। বাংলায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে আবর পারস্যের সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৫৩২ খৃস্টাব্দের মধ্যে পারস্য কবি ফেরদৌসী, জামী, আনসারী প্রমুখ বর্ণিত নবী-ইউসুফ জোলেখার প্রেম সম্পর্কিত একটি মিসরীয় কাহিনীর ভিত্তিতে রচনা করেন "ইউসুফ-জোলেখা-প্রণয়োপাখ্যান"। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য। এ সময় বাংলার স্থানীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্য প্রবহমান ছিল। ফলে মুসলিম লেখক শাহ মোহাম্মদ সগীর বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের আনন্দদানের লক্ষ্যে বাংলা সংস্কৃতির আদলেই বাংলার বারো মাসের অনুসরণে জোলেখার বারমাসী লিখেন। এই কাব্যের বিধুপ্রভা বাঙ্গালী মেয়ে। তিনি এই বাক্যের মিসরীয় কাহিনীকে বাংলার চাঁচে ঢেলে পরিবেশন করে বাংলার বিষয় যোগ করে বাংলারই কাব্য করে তোলেন। শাহ মোহাম্মদ সগীরের আগে কিংবা সমসাময়িককালে অথবা স্বল্পকাল পরে সারবিদ খান রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য বাংলারই একটি

www.pathagar.com

প্রণয়োপখ্যান। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তিনি দ্বিতীয় এবং প্রথম মুসলিম কবি। (প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর)

দৌলত উজীর বাহরাম খানের লায়লী-মজনু একটি প্রণয় কাহিনী। এই কাহিনী আরবে কল্পিত হলেও কোন আরব দেশে এই কিংবদন্তী চালু নেই। এছাড়া আরবে কল্পিত দেখালেও কবি এই কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ পরিহার করে বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন সচেতনতার সাথে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান। তিনি ছিলেন একজন পীর। কিন্তু তিনি রামায়ণ, মহাভারত, বেদপুরাণ আত্মস্থ করে তার ভিত্তিতে নবী বংশ রচনা করেন। অমুসলমানদের ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে, কুরআন-কিতাব সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা এবং জ্ঞানদান করার লক্ষ্যে তিনি হরিবংশ পুরাণ অনুসরণ করে নবী বংশ লেখেন। ফলে সৈয়দ সুলতানের লেখাতেই প্রথম সংস্কৃতি, আরবী, ফার্সি এবং বাংলা-এর সমন্বয় ঘটে। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খান ও অন্যান্যরা বাংলা সাহিত্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

(তথ্য মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি-কাজী জাফরুল ইসলাম)

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তন কালে বাংলার ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল দেবভাষা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা ছিল শুদ্রের (নিচ) ভাষা। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্মীয় বই লেখা নিষিদ্ধ ছিল এবং শুদ্রদের ধর্মীয় বই ছুঁতেও দেয়া হতো না। এ ছাড়া ব্রাহ্মণরা বাংলা সাহিত্যকে এই বলে অভিশপ্ত করতো যে, যারা অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে তারা রৌরব নামক নরকে যাবে। এ কারণে চর্যাপদের পর সুদীর্ঘকাল, হিন্দুরাজত্বের সময়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা হয়নি। মুসলিম শাসনামলেই বাংলায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। (খাঁটি বাংলা ভাষায় চণ্ডীদাস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচনাকালে বাংলায় [গৌড়ে] ছিল মুসলিম শাসন)। এসময় হোসেন শাহের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরোক্ষ সাহায্যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন মুসলমান লেখকরা। ফলে ষষ্ঠদশ শতব্দীর মধ্যেই অসংখ্য মুসলমি সাহিত্যিকের অভ্যুদয় ঘটে। তাদের হাতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের সপ্তদশ শতাব্দীর দু'জন শ্রেষ্ঠ কবিই হচ্ছেন মুসলমান। তাঁরা হলেন কাজী দৌলত ও আলাওল। তাঁদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র কিন্তু বাংলাদেশ ছিল না, ছিল আরাকান। সুলতানী আমলে শাসকেরা এমনকি স্থানীয় সামন্ত শাসকেরাও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সুলতানী শাসকের পতনের যুগে বহু সংখ্যক আমীর ওমরাহ সুফী সাধক ভাটি অঞ্চল, সিলেট ও চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পরে সিলেট-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু মুসলমান আরাকানে গিয়ে রাজ অমাত্যের স্থান দখল করেন। বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর যাঁরা মোগল শাসক হিসাবে বাংলায় আসতেন তাঁরা সময় শেষে ফিরে যেতেন, বসতি স্থাপন করতেন না। তাই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। কিন্তু

www.pathagar.com

তা সত্ত্বেও ঐ সময় বহু সংখ্যক সাহিত্যিক নিজস্ব উদ্যোগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। চট্টগ্রাম-সিলেটের যে সব ব্যক্তি রোসাঙ্গ রাজার অমাত্য হয়েছিলেন তাঁদের উৎসাহে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র। সেখানেই কাজী দৌলত ও আলাওলের উদ্ভব ঘটে। এই দুই কবি বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতি, বাংলা, আরবী, ফার্সি, হিন্দী সঙ্গতভাবে যুক্ত করেন।

ফলে একথা বলা যায় যে, মধ্যযুগের মুসলিম শাসকরাই বাংলা সাহিত্য চর্চার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ও লেখকরা যে ভাবে বাংলা ভাষার সংরক্ষণ করেছেন বলা যায় তারাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থপতি।

ইংরেজ রাজত্ব ও বাংলা ভাষার সংস্কার

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের পর ক্রুসেডের পতাকাধারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বৈদেশিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনকামী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শত বছরের আঁতাত ও ষড়যন্ত্রের ফলরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো ইংরেজ রাজত্ব। এতে ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্য শাসনে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক মুসলমানদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল পথ রুদ্ধ হলো। তাদের সাংস্কৃতিক জীবন নিমজ্জিত হলো ঘোর অন্ধকারে। বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও সেনা বিভাগসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তারা বিতাড়িত হলো। সরকারী চাকুরি কিংবা বেসরকারী কর্মক্ষেত্রের সকল দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো। ১৭৭২ সালের ইজারা চুক্তি ও ১৭৯৩ সালের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" ফলে মুসলিম জমিদারগণ রাতারাতি পথে বসলেন। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইনে মুসলিমদের হাজার হাজার শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় মুসলিমদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সামাজিক আন্দোলনের জন্ম হয়। মুসলিমরা চিহ্নিত হয় বিদ্রোহী প্রজা নামে।

মুসলিম সমাজের বিপরীত এ সময় ইংরেজ শাসনে লাভবান ও উল্লসিত বর্ণ হিন্দু সমাজ ইউরোপীয় ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী নামের এক ইংরেজ কলকাতায় এসে হুগলীর শ্রীরামপুরে খৃস্টান মিশনে যোগ দেন। এই উইলিয়ামের নামেই ১৮০০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮৩২ সালে গঠিত হয় কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সংস্কৃত কলেজ। ফোর্ট ইউলিয়াম আর খৃস্টান মিশনের মাধ্যমে ফরস্টার মার্শম্যান, উইলিয়াম কেরী প্রমুখ ইংরেজ রাজনীতিক এক শ্রেণীর বর্ণ হিন্দুর সহায়তায় বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে দেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাদ দিয়ে সংস্কৃত নির্ভর এক তথাকথিত "বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য সৃষ্টির চেষ্টায় মেতে ওঠেন।"

এ থেকে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা মায়ের ভাষা বই-পুস্তক থেকে নির্বাসিত হলো।

www.pathagar.com

হরফ থাকলো বাংলা কিন্তু সেই বাংলা হরফের আদলে জনগণের ওপর মৃত সংস্কৃতের লাশ চাপিয়ে দেয়া হলো। এভাবে ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র সফল হলো। হিন্দু পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে এলেন। তাঁরা এ ভাষাকে হিন্দু সভ্যতার বাহন করে তুললেন। মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের মূল নির্মাতা এবং তাঁরাই বাংলা ভাষার প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সময় মুসলিম সমাজের লেখকগণ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির একটি দুর্বল ধারা অব্যাহত রাখলেন। পলাশীর বিপর্যয় না হলে যে লোকজ ভাষা এদেশের হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা হবার কথা ছিল, ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলিম লেখকদের সে ভাষার রচনাগুলো আখ্যায়িত হলো "বটতলার পুঁথি" নামে। এ সময় থেকেই বাংলা ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো। শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ইতিহাস।

ভাষা অন্দোলনের পটভূমি

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধস্ত হবার পর বাঙালী মুসলিমদের ইংরেজবিরোধী আপোষহীন লড়াইয়ে ছেদ পড়ে। নতুন করে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংজেদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের পরিবর্তে নিজ সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই পর্যায়ে সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিমরা নতুনভাবে প্রবেশ করলেন। কিন্তু এতোদিন প্রতিবেশী সমাজ অনেক পথ এগিয়ে গেছে। ফলে বাংলা ভাষা চর্চায় মুসলিমদের স্থান হলো পেছনের সারিতে। কেননা, বাংলা সাহিত্যের নতুন আসর হিন্দুদের তৈরি এবং এই পর্বে তারাই এর নায়ক।

এ অবস্থায় কিছু কালের জন্য হলেও সাহিত্য চর্চায় হিন্দুদের অনুসরণ ছাড়া তাদের আর পথ রইলো না। এ অবস্থা পরিবর্তনের প্রেরণা থেকেই বিংশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতায় "বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য পরিষদ"-এর মত প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। তখন থেকেই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়। তখন সচেতন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। এ আন্দোলনের সাথে আমাদের আবেগ অনুভূতি প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে। ভাষা আন্দোলনের যে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে গবেষকরা তাকে ৪টি পর্বে সুবিন্যস্ত করেছেন। ১. মানসিক পর্ব, ২. সাংগঠনিক পর্ব, ৩. সংগ্রাম পর্ব এবং ৪. বিজয় পর্ব।

ভাষা আন্দোলনের মানসিক পর্ব

বাংলাভাষা বাঙালী মুসলিমদের মাতৃভাষা। এ ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা। এ কথা সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর পূর্বে কোন অভিজাত মুসলিম এমন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই উপমাহদেশে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রথম প্রস্তাবক।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১১ সালে রংপুরে মুসলিম প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশেও বাংলা ভাষার পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। তিনি যুক্তি

www.pathagar.com

সহকারে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জোর সুপারিশ করেন।
(তথ্য : সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ডক্টর আলি নওয়াজ, অগ্রপথিক, ১২ মার্চ, ১৯৮৭।)
বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারত বর্ষের একটি সাধারণ ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতে রাষ্ট্রভাষা রূপে হিন্দীর পক্ষে দাবি তোলেন। বাংলার বাইরের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিমদের রায় ছিল উর্দুর পক্ষে। কিন্তু বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে থেকেই এ সময় বাংলার পক্ষে আওয়াজ ওঠে।
১৯১৮ সালে "বিশ্বভারতীতে" অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দী সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা ভাষার দাবি পেশ করেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সারা ভারতের ভাষাতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতগণ সে সভায় উপস্থিত হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বভরতীয় সভায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধটি পাঠ শেষ হলে সভাস্থলে মহা হৈ চৈ পড়ে যায়।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধটি সমকালীন "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ-১৩২৭/১৯২০ খ্রী:)
(তথ্য : ভাষা আন্দোলনের ডায়েরী, মোসতফা কামাল, পৃ-১৩)
১৯২১ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য লিখিতভাবে দাবি উত্থাপন করেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। দাবীনামায় তিনি লেখেন : ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক, বাংলার রাষ্ট্র ভাষা করতে হবে বাংলাকে।
১৯৩৭ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'দৈনিক আজাদ'-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, "সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের সংখ্যাই বেশি। অতএব বাংলা ভাষা সব দিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষার চেয়ে হিন্দীর যোগ্যতা কোন দিক দিয়াই বেশি নহে।"
(ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ভাষার লড়াই, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মারক)
পাকিস্তান আমলের ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি নির্মিত হয়েছে সাতচল্লিশের ভারত বাটোয়ারার ভিত্তিতে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে সাতচল্লিশের আগস্ট মাসে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম না হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন করার ক্ষেত্রই তৈরী হতো না।
কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা উনিশ শতক ও বিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে

www.pathagar.com

বাংলাভাষা চর্চায় এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে হিন্দীর কাছে সমর্পিত হয়ে সাংস্কৃতিক আত্মবিলোপের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। তাদের চেয়ে অনগ্রসর, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত ও বঞ্চিত, কৃষিজীবী মুসলিম অধ্যুষিত অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে স্বাধীন হলে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব যেমন সম্ভব হতো না, তেমনি সম্ভব হতো না সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা। বরং অখণ্ড ভারতে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসমিলদের অবস্থা কি হতো তা বুঝার জন্য আজকের অধিকৃত কাশ্মির এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অবস্থার দিকে নজর দিলেই তা সহজেই বুঝা যায়।

ফলে ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের শঠতা, প্রবঞ্চনা ও চক্রান্তমূলক বাটোয়ারা কৌশলের ফসল হিসাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের মানসিক পর্ব শুরু হয়।

বাঙালী মুসলিমগণ ঢাকায় বাংলা ভাষার রাজধানী করার সংগ্রাম ও কুরবানীর পথে অগ্রসর হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্ব

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই কলিকাতা ও ঢাকায় যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে দু'টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান দু'টির বিভিন্ন সভায়ও বহুবার বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা আলোচিত হয়। ১৯৪৩ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সম্মেলনে সংসদের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন হবে বাংলা ভাষা এ প্রশ্ন বহু পূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে।"

সভাপতি হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়ে আবদুল মওদুদ বলেন, "পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যেমন ভাষা বিজ্ঞানে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ অবদান উর্দু ভাষা, সেই রকম পূর্ব ভারতে মুসলিমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে বাংলাভাষা।" এ সময় রেনেসাঁ সোসাইটির উৎসাহী সমর্থক কবি ফররুখ আহমদ বাংলার সমর্থনে এবং এক শ্রেণীর উর্দু প্রেমিক বঙ্গ-সন্তানদের তীব্র সমালোচনা করে "উর্দু বনাম বাংলা ভাষা"-শীর্ষক ব্যাঙ্গ সনেট রচনা করেন। এই সনেটটি ১৩৫২ বাংলা সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তমুদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র শিক্ষকের সহযোগিতায় ভাষা আন্দোলনের এই জনক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে তমুদ্দুন মজলিস ছিল একটি চমকে

www.pathagar.com

দেওয়া বিপ্লবী নাম। ভাষা আন্দোলনে মজলিসের মুখপত্র "সৈনিক" পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ফজলুল হক মুসলিম হল মিলনায়তনে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে খ্যাতনামা শিল্পী জয়নুল আবেদীনের অভ্যর্থনা উপলক্ষে এক সভায়ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করা হয়।

১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে এক ছাত্র সভায় অংশগ্রহণ করেন। তখন ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দাবি সম্বলিত এক ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডাকসুর তৎকালীন জি.এস. অধ্যাপক গোলাম আযম স্মারকলিপিটি পাঠ করেন এবং হস্তান্তর করেন। এই স্মারকলিপিটি গ্রন্থনায় ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। পরবর্তীতে এ দাবিগুলোর ভিত্তিতে এদেশে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীকার আন্দোলন গড়ে ওঠে।

স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবকাঠামোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাতচল্লিশ সাল এবং তার পরবর্তী রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ছিলো আমাদের হাজার বছরের ভাষার লড়াইয়ের ধারাবাহিকতার একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়।

ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম পর্ব

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের সম্পাদনায় তমুদ্দুন মজলিস-এর উদ্যোগে পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের হয়। তখন তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'ও গঠিত হয়। এ পরিষদ নানা সভা-সমাবেশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধরার চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট এবং প্রদেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ মার্চ একটি মাইলফলক। এ ধর্মঘটের কারণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এগিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৭ দফা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে উর্দুর সাথে সাথে বাংলভাষাকেও সমান মর্যাদা প্রদান এবং পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাকে চালু করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ফলে এ দেশের মানুষ ধরে নিয়েছিল তারা তাদের মুখের ভাষার মর্যাদা ফিরে পাবে। কিন্তু সরকার অচিরেই এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করলো। ১১ই মার্চ থেকে ২১ মার্চ এর মধ্যেই পাল্টে গেল দৃশ্যপট। ২১ মার্চ পাকিস্তানের জনক ও তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফরে এলেন।

www.pathagar.com

তখন কার্জন হলে আয়োজিত বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোন ভাষা নয়।' কায়েদে আযমের এ ঘোষণা ছিল এ দেশের মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত। তাই এ ঘোষণার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো দেশ। ফের শুরু হলো ভাষার আন্দোলন। প্রতিবাদ প্রতিরোধে কেঁপে উঠলো সারা দেশ। ভাষার দাবিতে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ ও শ্লোগানে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। মানুষ আশা করেছিল সরকার এ দেশের জনগণের দাবিকে মর্যাদা দেবে এবং বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে নেবে। ঘটনা ঘটলো উল্টো। এরই মধ্যে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশন। এখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করলেন : 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' দেশের মানুষ আরেকবার হতাশ হলো। তারা আর স্থির থাকতে পারলো না। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদে আবার জেগে উঠলো দেশ। ৩০ জানুয়ারী ঢাকায় পালিত হলো প্রতিবাদ দিবস।

এখানেই থেমে থাকেনি দেশের মানুষ। তাদের ক্ষোভ ও বিদ্রোহ তীব্র হতে থাকল। ফলে ভাষার আন্দোলন আরো সংগঠিত হল। ৩১ জানুয়ারী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবার জাতীয় পর্যায়ে গিয়ে গঠিত হল 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' নামে। শুরু হল নতুন উদ্যোমে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ।

ভাষা আন্দোলনের বিজয় পর্ব

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করল। অথচ সরকার জনগণের এ দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য একই দিন ঢাকা শহরে, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং জারি করল ১৪৪ ধারা। কিন্তু তাতেও মানুষের ক্ষোভকে থামানো যায়নি। ১৪৪ ধারা ভংগ করে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। বাধা আসে পুলিশের। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে দমন করতে পুলিশ মিছিলের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। এতে ৩ জন ছাত্রসহ ৪ ব্যক্তি নিহত হন, ১৭ জন আহত হন এবং গ্রেফতার হন ৬২ জন। পুলিশের গুলিতে যারা শহীদ হন তারা হলেন, রফিক উদ্দিন আহমদ (মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র), আবদুল জব্বার (গ্রামীণ কর্মচারী), আবুল বরকত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম.এ ক্লাসের ছাত্র), মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র) এবং আবদুস সালাম (শুল্ক বিভাগের পিওন, আহত অবস্থায় ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন)। ২২ তারিখ নিহতদের গায়েবানা জানাযা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার পর লক্ষাধিক মানুষের এক বিশাল শোভাযাত্রা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। এ ঘটনার পর

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার ভিত নড়ে ওঠে। এ দেশের মানুষ বুঝতে পারে পাকিস্তানী শাসকদের হাতে তাদের ভাষা, স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদা নিরাপদ নয়। তাই ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা লড়াইয়ে মানুষ অর্জন করে মহান স্বাধীনতা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফল হিসাবে আমরা যে স্বাধীনতা পেলাম তা আজ আমাদের পরম পাওয়া। তাই ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানীরা আমাদের সবার কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। আমরা তাঁদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

আমাদের এ মহান ভাষা আন্দোলন এবং তারই পথ ধরে স্বাধীনতা অর্জন বিশ্বের দরবারে আমাদের গৌরবকে অনেক উচ্চে তুলে ধরেছে। আমরা আরো বেশি গর্বিত হয়েছি যখন আমাদের ভাষা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গোটা বিশ্বের কাছেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা এখন 'আন্তর্জাতিক ভাষার' স্বীকৃতি পেয়ে গৌরবের আরেক ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এ মহান কাজে যারা অবদান রেখেছেন তাঁরাও বাংলাদেশী। তাঁরা এ জাতির কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিশ্বে বাংলাভাষী জনগণের সংখ্যা প্রায় ৩০ কেটি। বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে পাকিস্তান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিপুল সংখ্যক বাঙালীর বসবাস। মধ্যপ্রাচ্যের সবকটি দেশ মালয়েশিয়া, কোরিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের জন্য বিপুল সংখ্যক বাংলাভাষী বসবাস করছেন। জাতিসংঘ শান্তি বাহিনীর বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী সৈনিকদের কাজকর্মের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আফ্রিকান দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে সে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছে। এর আগে থেকে পাকিস্তান ও ভারতে বাংলাভাষা অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। এদিক থেকে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইতিমধ্যে মর্যাদার দাবিদার.।

জাতিসংঘ যেসব ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে তার বেশির ভাগই বাংলার চেয়ে কম প্রচলিত। ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে সাহিত্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা ভাষার কবি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলা ভাষা ভাষী জনগণের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ভাষার প্রতি বাংলা ভাষী জনগণের দরদ বিশ্বের সকল ভাষায় সুরক্ষার ও যথাযথ স্বীকৃতির পথ দেখিয়েছেন।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের ইউনিসেফের এক বৈঠক বসে প্যারিসে। সভার ১৮৮ জন সদস্যের সমর্থনে আমাদের ভাষা সেদিন অমর মর্যাদা লাভ করে। এর আগে বিশ্বের ২৮টি দেশ বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘে উত্থাপনের সমর্থন জানায়। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবার পেছনে কানাডা প্রবাসী একদল বাংলাদেশী নাগরিকের অবদান ছিল সীমাহীন। তাদের সংগঠনের নাম 'মাদার ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট' এর নেতা

www.pathagar.com

ছিলেন জৈনক রফিকুল ইসলাম। এ ছাড়াও যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন-জ্যাসন মেরিন, সুসান হভগিল, ড. কেলভিন চাও, বিনতে মারটিনস, করুনা জোসি, নাজনিন ইসলাম, আবদুস সালাম প্রমুখ। আজ বাংলা ভাষার যে মর্যাদা নিয়ে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি তাকে অর্থবহ করতে হলে ভাষার মান উন্নয়নে আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, বাংলা ভাষা এখনও দেশের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ সিয়েরে লিয়েনের সরকারও বাংলাকে ভালবেসে তাদের দেশের অন্যতম ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আমাদের সরকার বাংলাভাষার উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ■

লেখক পরিচিতি : শরীফ আবদুল গোফরান– কবি, শিশু সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক।

লেখা পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২০শে নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

সাহিত্য সেমিনার প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

■

শব্দ-সংস্কৃতি

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, শব্দ-সংস্কৃতির নীতি ও চরিত্র হলো তার সময় এবং আদর্শ। যখন যে আবহাওয়া ও আদর্শ থাকে, তখন সেই শব্দ-সংস্কৃতিই গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। সুতরাং আমাদের শব্দ-সংস্কৃতিতেও প্রতিফলিত হবে মুসলিম আকিদা-বিশ্বাস, এটাই স্বাভাবিক। কারণ শব্দের সাথে আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পৃক্ত।

গত ২০শে নভেম্বর, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'শব্দ-সংস্কৃতি' শীর্ষক এক সাহিত্য সেমিনারে জনাব আবুল আসাদ সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে 'শব্দ-সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কবি আহমদ আখতার, জনাব শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত প্রমুখ।

www.pathagar.com

উক্ত সাহিত্য-সেমিনারের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের কুরআনিক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। যে শব্দ আমাদের আকিদা এবং ঐতিহ্যের বিপরীত সে সকল শব্দ পরিহার করা জরুরি। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, বাংলাভাষার উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক বহু দিনের। বাংলা ভাষা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। দু:খের বিষয়, আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে না। বাংলা ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং এর আদি রূপ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। এ বিষয়ে গবেষকদেরও প্রচুর পরিশ্রমী এবং জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

গত ২০শে নভেম্বর, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সাহিত্য সেমিনারের সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি হাসান আলীম। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন কবি আশরাফ আল দীন, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কথাশিল্পী মোহাম্মদ লিয়াকত আলী প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, ভাষা আন্দোলনের সাথে বহুবিধ ধারা সম্পৃক্ত। আমাদের মূল ধারাকেই শনাক্ত করে জনসমক্ষে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ভাষার লড়াইয়ে জিততে হলে সাহিত্যের লড়াইয়েও জিততে হবে।

গত ২০শে নভেম্বর, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সাহিত্য সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারে 'বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামের ইতিহস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি শরীফ আবদুল গোফরান। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন কবি আশরাফ আল দীন, কবি নাসির হেলাল, কথাশিল্পী মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, কবি মহিউদ্দিন আকবর প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান। ■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা